ভার্চুয়াল রাজ্য কাউন্সিল সভা

গত ৯ জানুয়ারি ২০২৫ কেন্দ্রীয় কমিটির সভার অনুমোদনক্রমে ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ জরুরি ভিত্তিতে সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া এই সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। পরবর্তীতে ২১টি জেলা ও ৬টি অঞ্চল আলোচনাকরে। সবশেষে জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এই ভার্চুয়াল স্টেট কাউন্সিল সভা থেকে বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা সহ আগামী কর্মসূচী বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১। আগামী ২৬ জানুয়ারি ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সারা রাজ্যব্যাপী সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ ও মানব বন্ধন কর্মসূচী রূপায়ণ করতে হবে। কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১১টায় মৌলালী মোড়ে জমায়েত হয়ে এই কর্মসূচী পালন করা হবে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা নীচে দেওয়া হল।

২। আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সারা রাজ্যব্যাপী রূপায়ণ করতে হবে। উক্ত দিনে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অরবিন্দ সভা কক্ষে বেলা ১২টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল ৪টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সমিতি ও অঞ্চল কমিটিকে মহিলা সহ কর্মাচরীদের উপস্থিতির উদ্যোগ নিতে হবে।

৩। বিগত রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলমান সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে সংগঠন তহবিল সংগ্রহের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে সমাপ্ত করে কেন্দ্রীয় প্রাপ্য অর্থ ও মোট সংগৃহীত অর্থের সমিতি ভিত্তিক তথ্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে।

৪। বর্তমান সাংগঠনিক বছরে সদস্যভুক্তির যে ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে, পরিস্থিতিজনিত বাস্তবতাকে ধারণ করে দ্রুত তা সম্পন্ন করতে হবে।

৫। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি জেলার উদ্যোগে ব্লকস্তর পর্যন্ত সফরসূচী সংগঠিত হয়। সংগঠনের অভ্যন্তরে কিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও সাংগঠনিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত সমিতির কেন্দ্রীয় সফর করতে হবে। পাশাপাশি, সমিতিগুলিকে আদায়যোগ্য স্থানীয় দাবিগুলি নিয়ে কর্মসূচীও গ্রহণ করতে হবে।

৬। দেশের সাধারণ ও রাজ্য বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী পেশ করা হলে তৎপরবর্তীতে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করতে হবে।

৭। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ১১ দফা দাবি নিয়ে আগামীতে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। দাবিসনদ সহ কর্মসূচীর সামগ্রিক পরিকল্পনা পরবর্তীতে জানানো হবে। এই কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮। ২০২৫ সালের এমপ্লয়িজ ফোরাম-এর গ্রাহকভুক্তি বাবদ ১২০ টাকা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করতে হবে। □

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/ ৮৪/২৪ তারিখ ঃ ৩০/১২/২৪

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান

মাননীয়া,

আমরা সকলেই জানি মহার্ঘভাতা প্রদানের বিষয়টির সাথে মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। মহার্ঘভাতা মানে বেতন বৃদ্ধি নয়, মূল্যবৃদ্ধিজনিত বেতনের ক্ষয়রোধের একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। স্বভাবতই যে সময়ে খাদ্যশস্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, তখন মহার্ঘভাতা প্রদান সম্পর্কে সরকার ইতিবাচক অবস্থা গ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশিত। কেন্দ্র ও প্রায় সবক'টি রাজ্যের সরকার সময়ান্তরে এই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। কোনো বিশেষ মহানুভবতার কাজ করছে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটি যেহেতু একটি জাতীয় সমস্যা, তাই সর্বভারতীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকের (এ আই সি পি আই) ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি মহার্ঘভাতা প্রদান করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে, রাজ্য সরকারগুলিও তাকে অনুসরণ করে।

অথচ আমাদের রাজ্যে আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার এই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত কাজটিকেও দীর্ঘদিন ধরে চরম অবহেলা করেছে। যার পরিণতি হল বিপুল পরিমাণ (৩৯ শতাংশ) বকেয়া মহার্ঘভাতা। ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকরী হওয়ার পরে, এখন পর্যন্ত মাত্র ১৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান করা হলেও, তা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় হার অনুসরণ না করেই। দেশব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতি থেকে এটি গুরুতর বিচ্যুতি।

দেশব্যাপী স্বীকৃত এই স্বাভাবিক প্রাপ্তি থেকে রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারী ও শিক্ষকদের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই বঞ্চিত করে রাখার যে পথ সরকার গ্রহণ করেছে তাতে সংশ্লিষ্ট অংশ ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধও। গণতান্ত্রিক পরিসরেই এই ক্ষোভের বহুবিধ বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এমনকি উচ্চ আদালতও রাজ্য সরকারের ভিত্তিহীন নেতিবাচক ভূমিকাকে মান্যতা দেয়নি। এতদসত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ভূমিকার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকি মূল্যবৃদ্ধির আবহে নিয়মিত মহার্ঘভাতা প্রদান যে আবশ্যিক, তাকে অস্বীকার করে, একে নির্দিষ্ট অংশের 'বিলাসিতা' বলে চিহ্নিত করে, পরিকল্পিতভাবে জনসমাজের অপরাপর অংশের সাথে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। ভ্রান্ত এই অপচেষ্টা নিশ্চিতভাবেই নিন্দনীয় ও কঠোর সমালোচনাযোগ্য।

৩৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকার ফলে প্রতি মাসে একজন বেতনভুক কর্মচারী বা শিক্ষকের কত টাকার বঞ্চনা হচ্ছে, তা আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন। টাকার অঙ্কে এই বিপুল ক্ষতি একজন কর্মচারী বা শিক্ষকের আর্থ-সামাজিক সুস্থিতিকেও দুর্বল করছে। অথচ আর্থিক বঞ্চনার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কাজের বোঝা। একজন কর্মচারী বা শিক্ষককে তার নির্দিষ্ট দায়িত্বের বাইরেও বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। ক্রমাগত বেতন ক্ষয়ের শিকার একজনের কর্মচারী বা শিক্ষকের পক্ষে অতিরিক্ত কাজের বোঝা বইবার মতো মানসিক প্রণোদনা মজুত রাখা সম্ভব বলে মনে হয় কি আপনার? কখনোই নয়। এমতাবস্থায়, এ যাবৎকাল মহার্ঘভাতা সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে, তা থেকে সরে এসে, কেন্দ্রীয় হারেই বকেয়া প্রদানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

অতীতে বিভিন্নভাবে একই দাবি পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষ গত অক্টোবর মাসে (পত্র নং কো-অর্ডি/ ৬২/২৪ তাং ২৯-১০-২০২৪ পত্র মারফৎ) রাজ্য সরকারের সুবিবেচনার প্রত্যাশা নিয়েই এই দাবি পেশ করা হলেও রাজ্য সরকার কোনো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার ন্যায়সঙ্গত দাবিকে মান্যতা দিয়ে বকেয়া ৩৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানের অনুরোধ করছি।

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(সাধারণ সম্পাদক)

১৩ দফা দাবিতে অবস্থান ও কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার জন্মলগ্ন থেকেই শুধুমাত্র কর্মচারীদের নিজ বৃত্তিগত দাবিতে নয়, শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অংশ হিসাবে সাধারণ জনগণের দাবি দাওয়াকে যুক্ত করে নিয়েই নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে শ্রেণী সচেতনভাবেই তার আন্দোলন-কর্মসূচী-পথচলা নির্দিষ্ট করে এসেছে। মানুষের স্বার্থবাহী কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্ব-সদস্য বন্ধুরা যেমন একযোগে সরকারের সবচেয়ে আগুয়ান সৈনিকের ভূমিকা প্রতিপালন করেছে তেমনি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গৃহীত হলেই

বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

সমাজসচেতন মানুষের অংশ হিসাবে সংগঠন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচী থেকে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়েও অভয়া কাণ্ডের ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি লাগাতার পথে নেমে নাগরিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছে। রাজ্যজুড়ে বেড়ে চলা দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে, প্রতিটি দপ্তরে বিশাখা নির্দেশিকা সমন্বিত আইন কার্যকর, আবাস যোজনায় প্রকৃত উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার দাবিতেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার আন্দোলন জারি রেখেছে। জনজীবনের স্বার্থরক্ষাবাহী দাবি ও নিম্ন কর্মচারী সমাজের ব্যক্তিগত দাবিকে একত্রিত করে ১৩ দফা দাবিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ৬ ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বিগত ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বশেষ রাজ্য কাউন্সিল সভার (জরুরি ভিত্তিতে সামাজিক মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ২৯ অক্টোবর) সিদ্ধান্ত ক্রমে ১৩ দফা দাবিতে বিগত ২৬ নভেম্বর ২০২৪ জেলায় জেলায় এবং পরবর্তীতে ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ৬ ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বিপুল সংখ্যক কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে। প্রশাসনের নিকট নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় অবস্থান ও সমাবেশ কর্মসূচীর অনুমতি চাওয়া হলেও আগের দিন রাত্রি পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৌখিক সম্মতি জানিয়ে অবস্থান শুরুর প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচীর স্থায়ী মঞ্চ তৈরিতে বাধা দেয় পুলিশ প্রশাসন। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য ছিল অবস্থান ও জমায়েত কর্মসূচীকে বাধা দান করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার। কর্মী-নেতৃত্বের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের ফলে পুলিশ আধিকারিকরা কিছুটা পিছু হটে এবং ম্যাটাডোরের ওপর অস্থায়ী মঞ্চে সমাবেশের কাজ শুরু হয়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা। পরবর্তীতে ১৩ দফা দাবির সমর্থনে স্লোগান-এ আলোড়িত হয় আগুনে মঞ্চ থেকে গোটা সমাবেশ স্থল। কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মানস দাস ও অন্যতম সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

১৩ দফা দাবির সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় শুরুতেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণকে ধিক্কার জানিয়ে বলেন আমাদের দেশের বর্তমান শাসকদলের দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি ভূমিকাও অনুরূপ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশের তৎকালীন সরকারের ভূমিকা আপামর বাংলা তথা বামপন্থীদের নেতৃত্বে গোটা দেশের শ্রমজীবী মেহনতীর ভূমিকা

দেবব্রত রায়

তিনি এক্ষেত্রে স্মরণ করেন। পাকিস্তানের তৎকালীন সরকারের অনুরোধে আমেরিকার রণতরী পাঠানো এবং ভারত সরকারের আহ্বানে সোভিয়েতের পাল্টা রণতরী পাঠিয়ে আমেরিকার রণতরী দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে সোভিয়েতের ভূমিকা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ১৩ দফা দাবির সমর্থনে প্রস্তাবের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ২৬ নভেম্বর ২০২৪ জেলায় জেলায় এই দাবির সমর্থনে ইতিমধ্যে অবস্থান ও জমায়েত কর্মসূচী প্রতিফলিত হয়েছে। তার পূর্বে ২৫ নভেম্বর ২০২৪ জেলায় জেলায় জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচী প্রতিপালন করা হয়েছে। ২৬ নভেম্বর জেলা সদরগুলোতে রাজপথ দখল হয়েছে। আজ কলকাতার রাজপথ দখল হয়েছে। ধর্মতলায় সভা করতে বাধা দান করা হচ্ছে, আমরা কিছুটা কৌশল অবলম্বন করেই সহকর্মীদের সাহসে ভর করেই সমাবেশ করছি। কিছু বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা, আবেদনে সাড়া না দিয়ে হ্যারাস করা, নানাভাবে আক্রমণ, হুমকিকে উপেক্ষা করেই কর্মচারীরা এসেছেন। আজকের

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

দিনে মহিলারা পরিবারে / প্রশাসনে সংঘটিত-অসংঘটিত বিভিন্ন আক্রমণ, লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। বিশাখা নির্দেশিকা (PoS Act-2013) অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে রাজ্যের মুখসচিবকে পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে সর্বত্র পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে কর্মস্থলে মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হয়। রাজ্যের সর্বত্র মহিলাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন আদর্শ ভূমিকা পালন করা হয়। তিনি বলেন গোটা দেশজুড়েই চরম অরাজকতা চলছে। দেশের ঐক্য ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশের স্বনির্ভরতা, দেশের সংবিধান সবই আজ আক্রান্ত। বেকারীর হার সর্বোচ্চ কিন্তু বেকারী কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। মানুষ সংগঠিত হলেই বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে মানুষের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৪
কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
বাহান্নতম বর্ষ □ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

CamScanner

সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পরম্পরা রক্ষিত হোক বাংলাদেশে

যে কোনো দেশের মূলধারার রাজনৈতিক বাতাবরণে যখন রাজনীতির সাথে ধর্মের মিশ্রণ ঘটে, তখন সেই দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। মানবাধিকার বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা আক্রান্ত হয়। বিজেপি শাসিত আজকের ভারতে এই বিপদ যতটা প্রাসঙ্গিক, বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই মুহূর্তে সেটা সমপরিমাণ প্রাসঙ্গিক। আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষ, সাধারণ মানুষ বেশ কয়েকবছর ধরে এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। মনে রাখা প্রায়োজন ধর্মীয় মৌলবাদ এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জীবন জীবিকার জন্য সংগ্রামের থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন নয়।

বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে কোটা বিরোধী দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র আন্দোলন, নানা কারণে শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয় এবং তার পরিবর্তে ৫ আগস্ট '২৪ শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নোবেয়জয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। যারা এখনও পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করছে। গণঅভ্যুত্থানের শেষপর্বে যে আশঙ্কা মাথা চারা দিচ্ছিল, তা সরকারের পতনের পর প্রকাশ্য সত্যে পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থানকে সংখ্যাগুরু মৌলবাদী শক্তি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার শক্তি তাদের মতো করে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসও এই শক্তি দ্বারা প্রভাবিত তা এই সরকারের বিভিন্ন কার্যধারায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার হিসাবে উদ্ভুত চেতনার উপর আক্রমণ করা হতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিকতা—সে দেশের সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিগুলিকে বাতিল করার দাবি ওঠে। স্লোগান ওঠে সংবিধানকে কবর দেবার। কবিগুরু রচিত সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে বাতিল করার দাবিও ওঠে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ জামাত-এ ইসলামী বা হেফাজত-এ ইসলামীর মতো মৌলবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করে।

শেখ হাসিনা সরকারের ১৫ বছরের শাসনকলের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারের দুর্নীতি ও স্বৈরাচারী কিছু পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। জনরোষের ধিকি ধিকি আগুন কোটা বিরোধী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গে লেলিহান শিখাতে পরিণত হয়ে সরকারের পতন ঘটায়। কিন্তু এই গণআন্দোলনের প্রত্যাশিত অভিমুখ, যা হওয়া উচিত ছিল তা হল দুর্নীতিমুক্ত, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ একটি সরকার গঠন করার সাংবিধানিক উদ্যোগ গ্রহণ। অতি দ্রুত সংসদীয় নির্বাচন করে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিল মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম হাসিনা সরকারের পতনের পর ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি এবং মুক্তি যুদ্ধের ঐতিহাসিক পরম্পরার বিপ্রীত শক্তির হাতে আন্দোলনের রাশ অনেকটাই চলে গেল, শেখ মুজিবের বাড়ি, যেখানে একটি মিউজিয়াম করা হয়েছিল, সেটি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। আমাদের দেশের হিন্দুত্ববাদী শক্তির মতো ওখানকার সংখ্যাগুরু মৌলবাদও হুঙ্কার দিল যে সে দেশের সংখ্যাগুরুদের কথায় দেশ চলবে। আক্রমণ শুরু হল হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপসনাস্থলগুলিতে। আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে ঢাকা সহ চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় চাকমা সহ অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীগুলির ওপর। সব ধরনের বিরুদ্ধতার স্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস শুরু হল। ভারতের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকে শতযোজন দূরেয থাকা শক্তিসমূহের বর্তমান সময়ে দাপাদাপির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের মানুষ সে দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে সংস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু সে দেশের মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা বলছে যে স্বাধীনতার পরে গঠিত সব সরকার বা অন্তর্বর্তী সরকারগুলি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থ। ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রম সিঁদুরে মেঘের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আওয়ামি লীগ-এর সমর্থকদের উপর আক্রমণ, হত্যা, গ্রেপ্তার, সেখানকার বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আক্রমণ এবং বিরোধী কণ্ঠরোধের নানা ধরনের প্রক্রিয়া হাসিনা সরকার বিরোধী আন্দোলনের মূল স্রোতের বিরুদ্ধে যায়। এটাও দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ আমলে 'বঞ্চিত'-দের কোনো যুক্তি বিচার ছাড়াই পুনর্বাসনের পুরস্কার দেওয়ার প্রবণতা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ১৭৩ জন ডাক্তার যারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বি এন পি আমলে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করেছিলেন তাদের আওয়ামি লীগ সরকারের আমলে ন্যায্য পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কোনো তথ্য না যাচাই করে এদের সকলকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একদিনে পদোন্নতি ঘটিয়েছে। এর দ্বারা এরকম তথাকথিত বঞ্চনার অভিযোগকারী প্রশাসনের অন্য অংশও আন্দোলনে নামাতে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো যথেষ্ট উপাদান মজুত রয়েছে সেখানকার মানুষের কাছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ চাইছেন শেখ হাসিনা ওয়াজেদ সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া নানা গণতন্ত্রবিরোধী, এমনকি কখনও কখনও স্বৈরাচারী বিভিন্ন পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এই নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন একটি সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হোক। সেইজন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে সেখানকার নাগরিকদের অন্যতম আশু চাহিদা সেটাই। তাছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব হওয়ার মানে হল মৌলবাদী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে অক্সিজেন জোগানো।

আমরা যে সংগঠনের সদস্য সেই সংগঠনের ঐতিহ্য পরম্পরা হল ভিন দেশে মানবতা, গণতন্ত্র আক্রান্ত হলে অথবা কোনো স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক অন্য কোনো দেশের নাগরিকরা আক্রান্ত হলে আমরা তার প্রতিবাদ করি—শুধু তাই নয়, সেই দেশের আক্রান্ত মানুষের পাশে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়াবার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করি। ইজরায়েল কর্তৃক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে প্যালেস্তইানের উপর জায়নবাদী হামলা, ন্যাটো কর্তৃক ইউক্রেনকে কব্জা করার চক্রান্তই হোক অথবা কিউবার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অমানবিক অবরোধই হোক—রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার অনুগামী কর্মচারী সমাজকে নিয়ে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে দূর দূরান্তে।

এর উদ্দেশ্য মূলত দ্বিবিধ। প্রথমত আমি একজন মানুষ হিসাবে সৌর জগতের অন্যতম একটি গ্রহ পৃথিবীর অধিবাসী। এই গ্রহের কোনো স্থানীয় বা সামগ্রিক ভালো অথবা মন্দের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রভাব আমার বা আমাদের উপর পড়বে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সে স্থানীয় শুধু নয় সে আন্তর্জাতিক। সেই ভাবনার অনুপ্রবেশ এর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঘটানোটা একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদের স্থানিক সমস্যার সাথে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উপলব্ধির মধ্যে আনা। সেই সাথে অন্য দেশের ঘটনাবলীর প্রভাব অথবা অভিঘাত কিভাবে আমাদের উপরও পড়তে পারে তার ধারণাও এর দ্বারা তৈরি হয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ উপরোক্ত বিষয়গুলির জন্য অবশ্যই জরুরি। সেই প্রেক্ষিতেই বলা যায় যে ধর্মের সাথে রাজনীতির মিশ্রণ আমাদের দেশে যতটা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলছে, ততটাই প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে পারে যদি মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ চলে যায়। ভিন দেশের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের তৃতীয় দিকটি হল সেই ঘটনাবলীর সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিগুলির সাথে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র আছে। চীনকে কোণঠাসা করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে গেমপ্ল্যান সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তার সম্ভাবনারও কিছু দিক ফুটে উঠেছে ইতিমধ্যে।

কিন্তু সবার উপরে আমাদের উদ্বেগের বিষয় হল বাংলাদেশ আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দেশভাগের যন্ত্রণা এপার-ওপার দুই বাংলাকেই যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। সেই ক্ষত এখনও দগদগে আছে। সে দেশে যে কোনো অস্থিরতার সর্বার্থে প্রভাব পড়বে এই দেশের উপর বিশেষত্ব আমাদের রাজ্যে। বাংলাদেশের দক্ষিণভাগে বঙ্গোপসাগর, বাকিটা স্থল সীমান্ত। যার সিংহভাগ ভারতের সাথে, মাত্র ১৯৩ কিলোমিটার মায়ানমারের সাথে। ভারতের সাথে সুদীর্ঘ ৪০৯৬ কিমি. সীমান্তের-র মধ্যে ২২১৭ কিমি. সীমানা পশ্চিমবঙ্গের সাথে। সুতরাং সীমান্তপারের যে কোনো উত্তেজানকর পরিস্থিতির প্রতিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়বে আমাদের রাজ্যের উপর। এর সাথে অবশ্যই সার্বিকভাবে জাতীয় ক্ষেত্রে এর যা প্রভাব পড়বে তার অভিঘাতও আমাদের উপর পড়বে। এই কারণেই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসুক এটা আমাদের অবশ্যই কাম্য হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যাশা করব বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এটা বুঝবেন যে প্রথমত, ধর্মের সাথে রাজনীতির সংমিশ্রণ ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি শাসকশ্রেণীর হয়েই বকলমে কাজ করে, ফলে শ্রমিক তথা খেটে খাওয়া মানুষের উপর নিপীড়ন এর দ্বারা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।

ভালো থাকুক বাংলাদেশ। □

২১ শে জানুয়ারি, ২০২৫

উস্তাদ জাকির হোসেন

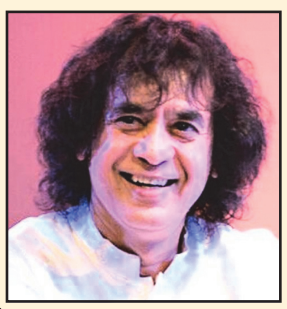

ইডিওম্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত হয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ৭৩ বছর বয়সে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোর একটি হাসপাতালে নিশ্চুপভাবে চলে গেলেন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডার তবলা মায়েস্ত্রা জাকির হোসেন। দীর্ঘদিন ভুগছিলেন ফুসফুসের বিরল রোগে। দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থার অবনতিতে প্রথমে আই.সি.ইউ ও পরে ভেন্টিলেশনে রাখা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর স্ত্রী অ্যান্তোনিয়া মিনেকোলা ও দুই মেয়ে আনিসা কুরেশি, ইসাবেলা কুরেশি এবং দুই ভাই তৌফিক এবং ফজল কুরেশি এবং বোন খুরশিদ আউলিয়া বর্তমান।

ভারত সরকার তাঁকে ১৯৮৮ সালে পদ্মশ্রী, ২০০২ সালে পদ্মভূষণ ও ২০০৩ সালে পদ্মবিভূষণ পদকে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি ১৯৯০ সালে ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক অ্যাকাদেমি পুরস্কার এবং ২০১৮ সালে সঙ্গীত, নাটক অ্যাকাদেমি ফেলোশিপ রত্ন সদস্য লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশানাল এনডাউমেন্ট ফর দি আর্টস' ন্যাশানাল হেরিটেজ ফেলোশিপ লাভ করেন।

হুসেন সাতটি গ্র্যামি পুরস্কারের মনোনয়ন থেকে চারটি পুরস্কার অর্জন করেন। তন্মধ্যে ২০০৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ৫১তম গ্র্যামি পুরস্কারের মিকি হার্ট ও জোভান্নি হিদালগোর সাথে যৌথ অ্যালবাম গ্লোবাল ড্যাম প্রজেক্ট-এর জন্য সমকালীন বিশ্ব সঙ্গীত অ্যালবাম বিভাগে এবং ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনটি গ্র্যামি অর্জন করেন।

জাকির হুসেন আল্লারাখা কুরেশী ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ ভারতের বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তবলাবাদক ওস্তাদ আল্লারাখা। তিনি মাত্র তিন বছর বয়স থেকে তবলা বাজানোর তালিম নেওয়া শুরু করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি একক মঞ্চানুষ্ঠান করেন। তিনি মহিমের সেন্ট মাইকেলস হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, মুম্বাই থেকে স্নাতক হন।

সঙ্গীতই ছিল তাঁর কাছে 'ধর্ম'। ফলে আজীবন ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ নিয়েই সঙ্গীতের সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'কোনো পুরোহিত কিংবা মৌলবীর কাছে শিক্ষা নিইনি। চিরকাল সত্য পথে চলার শিক্ষা পেয়েছি।' একারণেই ধর্মের ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে সঙ্গীতের আদর্শই বহন করে গিয়েছেন আমৃত্যু।

তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের দেশ-বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীরা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে শোক জানিয়েছেন। □

শোক সংবাদ

কমরেড সলিল শোভন রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহাকরণ অঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সলিল শোভন রায় দীর্ঘ অসুস্থতার পরে গত ২ জানুয়ারি '২৫, ৮৪ বৎসর বয়সে একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা বর্তমান।

১৯৪১ সালের অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বেলঘড়িয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা খুব স্বল্প বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন। তাঁর মা ননীবালা রায় খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে তার দুই সন্তানকে প্রতিপালন করেছিলেন। প্রয়াত ননীবালা রায় স্বল্প বেতনের স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন, অন্যদিকে তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী। বামপন্থী মতাদর্শের পরিবেশে কমরেড রায় মানুষ হয়েছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়সেই মায়ের সাথে পার্টি আহূত মিছিলে হেঁটেছিলেন। ঐ মিছিলে হাঁটার জন্য তাঁর মা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে তিনি সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছিলেন। কলেজে তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৬৫ সালে তিনি মহাকরণে শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। চাকুরীতে যোগদানের পরেই তিনি পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমঃ এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং অচিরেই নিজেকে সংগঠনের কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৭১ সালে সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে অন্ধকারময় কালো দিনগুলিতে যখন অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন তখন কমরেড রায় সংগঠনের দৃঢ়তার পরিচয় রাখেন এবং সাহসের সঙ্গে সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই সমিতির নেতৃত্ব সুশীল দাস, নিতাইহরি কর মজুমদার, অজয় মুখোপাধ্যায়, ভবতোষ রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বের সান্নিধ্যে তিনি কাজ করেছিলেন এবং নিজেকে একজন বামপন্থী মতাদর্শের কর্মী হিসেবে তৈরি করেছিলেন এবং আমৃত্যু বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি নিজস্ব সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০০৪ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে তিনি ১৯৮৩ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহাকরণ অঞ্চলের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ৯ বছর ঐ দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরেও দীর্ঘকাল নিজস্ব সংগঠন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেচিলেন। বিগত ক' বছর চোখে প্রায় দেখতে পারতেন না, সেই কারণে শারীরিকভাবে সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু মানসিকভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সংগঠন হারাল এক দৃঢ়চেতা, সাহসী, সংগঠনের প্রতি আজীবন দায়বদ্ধ এক নেতৃত্বেকে। □

অমিয় কুমার বাগচী

গত ২৮-১১-২০২৪ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী। প্রায় তিন মাস ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে অমিয় বাগচীর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। পদ্মশ্রী অমিয় কুমারের স্ত্রী নারী আন্দোলনের নেত্রী যশোধরা বাগচী ১০ বছর আগেই প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট নারীবাদী অধ্যাপক, লেখক তথা সমাজকর্মী। অর্থনৈতিক ইতিহাস তথা অর্থনীতির মার্কসবাদী গবেষণা করে যথেষ্ট সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন অমিয় কুমার বাগচী। তিনি কেবলমাত্র বরেণ্য অর্থনীতিবিদ বা গবেষকই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দক্ষ শিক্ষক।

অমিয় কুমার বাগচীর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার যদুপুরের একটি গ্রামে। পরবর্তীতে পড়াশোনার জন্য তাঁকে প্রথমে কলকাতা এব[illegible] সুদূর ইংল্যান্ডে পা[illegible] হয়। কলকাতার তৎ[illegible]সিডেন্সি কলেজে পড়াশোনার পাট চোকানোর পর কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকেই পি এইচ ডি অর্জন করেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসেন। কলকাতায় ফিরে যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজেই। শিক্ষক তথা অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরবর্তীকালে কলকাতাতেই সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স-এর সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণের পর কলকাতায় নবগঠিত ইনস্টিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা হিসাবে যুক্ত হন অমিয় কুমার বাগচী। ঔপনিবেশিক যুগের বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে শুরু করে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং এবং অর্থাবস্থার ইতিহাসের প্রবক্তা হিসাবে এই বাঙালি গবেষকের অবদান অনস্বীকার্য ও সর্বজনবিদিত। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ইতিহাস লেখক হিসাবেও এক যুগের বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন তিনি।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সুসংগঠিত যে মহাফেজখানা গড়ে তোলা হয়েছে, তার নেপথ্যে অমিয় বাগচীর বিরাট অবদান রায়েছে। এছাড়া, অর্থনীতি সংক্রান্ত অসংখ্য বইও লিখেছেন তিনি। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল পেরিলাস প্যাসেজ ঃ ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল অ্যামেনডেন্সি অফ ক্যাপিটাল, কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি, [illegible] অ্যান্ড লেবার রিফাইন্ড ঃ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি। □

CS CamScanner

... বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

উৎসর্গ মিত্র

মোটামুটি উনিশ শো আঠারো সালের শেষ ভাগেই জার্মান সেনা নায়কেরা বুঝে গিয়েছিলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ের মুখ দেখা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধান্তে যাতে অন্তত কিছুটা সুবিধাজনক শর্তাবলী তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা এক যোগে প্রিন্স ম্যাক্স ভন বাডেনের কাছে দরবার করলেন যাতে এমন একটা সরকার জার্মানীতে প্রতিষ্ঠা করা যায়, যা চরিত্রের দিক দিয়ে হবে কিছুটা গণতান্ত্রিক— অন্তত সম্রাট কাইজারের শাসনে জার্মানীর যে অবস্থা ছিল, হবে তার থেকে কিছু বেশি গণতান্ত্রিক। কিন্তু জার্মান নৌসেনা বাহিনীর সেনাপতিরা তখন মনে করতেন উল্টো কথা। তাঁরা মনে করতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্ম-সমর্পণ করার থেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। বাডেনের পক্ষে তাঁদের সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁরাও সাধারণ সেনাদের মন বুঝতে পারেননি। ১৯১৮-র অক্টোবরে যখন জার্মান রণতরী বাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে রওনা দিল, জার্মান নাবিক এবং সেনারা বেঁকে বসলো। আরও একটা যুদ্ধ, আরও একটা পরাজয় তারা কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল আর এই বিদ্রোহের কথা ছড়িয়ে পড়ল জার্মানীর দিকে দিকে।

প্রথমে কিয়েল, তারপর মিউনিখ, অতঃপর হ্যানোভার, হামবুর্গ এবং শেষমেশ বার্লিন। ৯ নভেম্বর, ১৯১৮— জার্মানীর সব ক'টা কারখানা স্তব্ধ করে দিয়ে হাজারে হাজারে শ্রমিক চতুর্দিক দিয়ে মিছিল করে এসে মিলিত হলো শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন মিছিলে আর শুধু শ্রমিকেরা নেই— সে মিছিল যতো এগিয়েছে, তার দৈর্ঘ্যও তত বেড়েছে। সাধারণ মানুষ ঘর ছেড়ে এসে পা মিলিয়েছেন শ্রমিকদের সাথে। সবাই যুদ্ধ বিরোধী। কে নেই সেই সব সারিতে! অস্ত্রাগারের সামনে জোর করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শত্রুর বুলেটে আহত মানুষ, যুদ্ধের কারণে পিতৃহারা সন্তান, মৃত সেনাদের স্ত্রীরা, আহত সৈনিক, ছাত্র এবং সাধারণ নাগরিক— সবাই সেদিন মিছিলে। কোনও নেতা তাঁদের জমায়েতের ডাক দেননি। শ্রমিকেরা বলেননি তাঁদের সাথে আসতে। তাঁরা এসেছেন সম্পূর্ণ নিজেদের তাগিদে, হাজারে হাজারে। তাঁরা মিছিল করেছেন নিঃশব্দে— কোনও স্লোগান নেই, এমনকি কোনও গানও নেই।

জনতা এসে দাঁড়ালো বার্লিনের মাইখেফা ব্যারাকের সামনে। ব্যারাকের গেট বন্ধ, কিন্তু জনতার হেলদোল নেই। তারা শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গেটের মুখ রুদ্ধ করে, গোটা ব্যারাক চত্বর ভরিয়ে দিয়ে। যুদ্ধে তারা সেনাদের যেতে দেবে না। ব্যারাকের প্রতিটা জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে রাইফেল আর মেশিন গানের নল। যখন তখন গুলি চলার মতো পরিস্থিতি। এক দিকে উর্দিধারী, অস্ত্রধারী সেনা, আর এক দিকে ছিন্ন বসন, হা-অন্ন, নিরস্ত্র হাজার হাজার মানুষ। অস্ত্র নেমে গেল... বন্ধ দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। উল্লসিত মানুষ ছুটে গেলেন ভিতরে... জড়িয়ে ধরলেন অস্ত্রধারী কিন্তু তাঁদেরই সহনাগরিকদের। আত্মসমর্পণ করলেন ভেতরে থাকা সেনা নায়কেরা— ঐ অ্যাডমিরালদের মতই যাঁরা মানুষের মন বুঝতে অক্ষম ছিলেন। মানুষের জীবনের বিনিময়ে যাঁরা 'বীরত্বের' গরিমা পেতে চেয়েছিলেন।

চতুর্দিকে এমন বিক্ষোভের আর সম্মিলনের খবর পেয়ে আসন্ন বিপদের কথা আঁচ করে সম্রাট উইলহেলম বাডেন সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে পালালেন দেশ ছেড়ে। তাঁর রাজসভার অন্যান্য সদস্যরাও সব একে একে হয় দেশ ছেড়ে পালালেন অথবা নিজে হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন জনতার হাতে। ১০ নভেম্বর সরকারপন্থী সংবাদপত্র 'বার্লিনার ট্যাজেব্লাট'-এ লেখা হলো, "গতকাল সকালে সব কিছুই সেখানে মজুত ছিল (মানে কাইজার, তাঁর পারিষদ চ্যান্সেলাররা এবং তাঁর সেনা নায়কেরা); গতকাল বিকেলে সেগুলোর কিছুই আর রইল না"! সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা তখন রাইখস্ট্যাগে সংখ্যাগুরু। দেশের ভার তাঁরাই গ্রহণ করলেন। 'রাজসম্পত্তি' জার্মানী পরিণত হলো এক নতুন 'গণতান্ত্রিক' দেশে। তার ভবিষ্যত কি হবে, তা পৃথক প্রশ্ন, কিন্তু রাতারাতি তার পরিচয় বদলে গেল আমূল— এ কথা অনস্বীকার্য।

এ এক অন্য বিপ্লবের কাহিনী। ইতিহাসে এও পরিচিত 'নভেম্বর বিপ্লব' নামে। 'নভেম্বর বিপ্লব' বললেই আমরা সাধারণত যে বিপ্লবের কথা মনে করি, তার থেকে এর সময়ের তফাত মাত্র এক বছরের, কিন্তু ঘটনার ঘনঘটা প্রায় একই রকমের। মনে করুন ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে পেত্রোগ্রাদের ঘটনা। একের পর এক হারের বোঝা মাথায় নিয়ে যুদ্ধদীর্ণ বিদ্রোহী হাজার হাজার রুশ শ্রমিক একের পর এক কারখানা বন্ধ করে দিয়ে জমায়েত হচ্ছেন তৎকালীন রাজধানী পেত্রোগ্রাদে রুটির দাবিতে, যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে, রাজতন্ত্রের অবসানের দাবিতে। সে জমায়েতে তৎক্ষণে এসে যোগ দিয়েছেন ছাত্ররা, সাধারণ নাগরিকেরা, শিক্ষকেরা, এমনকি উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারীরাও। মহিলাদের সংখ্যা এঁদের মধ্যে সর্বাধিক— প্রায় পঞ্চাশ হাজার! পেত্রোগ্রাদ অবরুদ্ধ। সব কারখানা বন্ধ। কোনো বাণিজ্য কেন্দ্র খোলা নেই। এর বছর বারো আগে এমন দাবিতে আন্দোলিত মানুষের বিদ্রোহকে জার (রুশ সম্রাটদের উপাধি) গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন এক দিনের গুলি বর্ষণে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ নিয়ে। ইতিহাসে সেই দিনটাকে 'ব্লাডি সানডে' বলা হয়। তাই এবারেও তাঁর বিশ্বাস ছিল সেনা বাহিনীর ক্ষমতার উপর। কিন্তু এবার পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। নামেই তখন রাশিয়ার সেনা সংখ্যা এক লাখ আশি হাজার, কিন্তু তাদের মধ্যে পুরোপুরি সক্ষম মাত্র হাজার বারো, বাকি সব হয় ক্ষিদের জ্বালায়, নয় ওষুধের অভাবে ধুঁকছে। তাই জার যখন এবারেও তাদের গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন (১১ মার্চ, ১৯১৭) ওই হাজার হাজার ক্ষুধার্ত বিদ্রোহী জনতার ওপর, তখন সেনারা যেন তাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরকেই দেখতে পেল। পারেনি তারা এবারে গুলি চালাতে। তারাও সামিল হলো বিক্ষোভে। গুলি চললো উল্টো দিকে। জারের পাশে থাকা সেনা নায়কদের একটা অংশ সরাসরি নিহত হলো আর বাকি অংশও শিবির বদল করে যোগ দিল বিদ্রোহীদের সাথে। ১৫ তারিখ পদত্যাগ করলেন জার নিকোলাস রোমানভ, সিংহাসনে মনোনিত করলেন তাঁর ছোট ভাই মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচকে। আঁচ বুঝে পরদিন পদত্যাগ করলেন তিনিও। তত দিনে তৈরি হয়ে গেছে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েত (শ্রমিক সংঘ)। পেত্রোগ্রাদে শাসন ক্ষমতা দখল করল তারা আর গোটা রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো গণতন্ত্রকামী কার্যনির্বাহী সরকার আর তার পরে নভেম্বর মাসে সেখানে ঘটে গেল বলশেভিক বিপ্লব। প্রতিষ্ঠা হলো দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। ষড়যন্ত্র নয়, অভ্যুত্থান নয়— বিপ্লব! এক লহমায় সমস্ত কিছু উল্টে পাল্টে দিয়ে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের এক সমাজ স্থাপনা।

রাশিয়ার সাধারণ মানুষ চেয়েছিলেন রাজতন্ত্রের উৎখাত। চেয়েছিলেন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। চেয়েছিলেন সমাজে তাঁদের অসম্মানের জায়গার থেকে মুক্তি— সোজা কথায় তাঁদের ধারণায় 'গণতন্ত্র' বলতে যা বোঝায়, সেটাই তাঁরা চেয়েছিলেন কারণ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে তাঁদের যেটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে তার বদলে তাঁরা যা পেলেন, তা গণতন্ত্রের থেকেও বেশি কিছু, যা দুনিয়ার মানুষ ইতোপূর্বে দেখেনি। এ এমন এক সমাজ, যেখানে কোনও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই, নেই নারী-পুরুষ বৈষম্য, এমনকি মজুরির ক্ষেত্রেও নেই কোনও বৈষম্য। এমন এক সমাজ, যেখানে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থান, মায় চিকিৎসা পর্যন্ত সবেরই দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলে নেয়। সেখানে ব্যক্তি-মালিকানা বলে কিছু নেই। সব মানুষই সেখানে সব কিছুর মালিক আর রাষ্ট্র চালায় শ্রমিকের প্রতিনিধিরা। 'উঁচু জাত', 'বিশেষ সুবিধাভোগী জাত' বলে কিছু নেই সেখানে। এমন 'স্বর্গ রাজ্য' দেখবেন, ভাবেননি কেউ। লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব করে রাশিয়ার মানুষ দেখিয়ে দিলেন ইচ্ছে করলে তাঁরা কি করতে পারেন, কতো দূর করতে পারেন।

এ কথা ঠিক যে এর সত্তর বছর আগেই ইয়োরোপে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবের কথা, সমাজ পরিবর্তনের কথা মানুষের কাছে এই মেনিফেস্টোর কারণে একেবারে অপরিচিত নয় আর। এ কথাও ঠিক যে, এর মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেই মার্কসের মহান গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' দিনের আলোর মুখ দেখে ফেলেছে এবং মানুষ তত দিনে দেখে ফেলেছে 'প্যারি কমিউন'কে, ধারণা পেয়েছে খেটে খাওয়া মানুষ বিপ্লবের পথে হাঁটলে 'কি হতে পারে'। কিন্তু রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির আদর্শের ভিত্তিতে স্পষ্ট ভাবে এবং নির্ণায়ক ভাবে বিপ্লবকে সমাধা করতে পারলে 'কি হয়'! গোটা পৃথিবীর সামনে রাশিয়া সেদিন দেখিয়ে দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শের জোর কতোটা। দেখিয়ে দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণি আর কৃষক শ্রেণি এক সাথে এগিয়ে এলে কি হয়, সাধারণ নাগরিক আর সৈনিকেরা এক সাথে যে কোনও লড়াইয়ে যোগ দিলে কি হয়, নারী এবং পুরুষ এক সাথে কুচকাওয়াজ করার হিম্মৎ রাখলে কি হয়!

সুতরাং এমন একটা ঘটনার থেকে জার্মানরাও অনুপ্রাণিত হবে—এটা তো স্বাভাবিক। সেখানে মানুষ তাই জেগেছে এবং কাইজারকে উৎখাত করেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে গণতন্ত্রের। কিন্তু এখানেই তাদের থেমে থাকতে হয়েছে কারণ তাদের এই 'জাগরণ'এর পিছনে কোনও 'মতাদর্শ' কাজ করেনি। ফলে সমাজতন্ত্রও ছিল তাদের কাছে অধরা। জার্মানদের অন্তত একাংশকে সমাজতন্ত্রের স্বাদ পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও বেশ কয়েকটা বছর। ইতোমধ্যে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেসির ছত্রছায়ায় কি করে হিটলারের উত্থান হয়েছিল, কি করেই বা তার পতন ঘটিয়ে অবশেষে একাংশের কাছে সমাজতন্ত্রের স্বাদ ধরা দিয়েছিল, সেটা কি করেই বা সম্ভব হয়েছিল, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু জার্মানীতে ১৯১৮-১৯-এর ঘটনাবলীর পিছনে যে রাশিয়ার বিপ্লবের অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল, সে কথা অনস্বীকার্য।

জার্মানী গণতন্ত্রে থেমে গেলেও রুশ বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের উপর ভর করে চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, গোটা পূর্ব ইয়োরোপ, উত্তর কোরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব হয়। আসলে রুশ বিপ্লব শুধু মাত্র রাশিয়াকেই বদলে দিয়েছিল তাই নয়, গোটা পৃথিবীকেই সে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়ে দিয়েছিল, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জয়লাভ করার ভরসা যুগিয়েছিল। ভারতও এর প্রভাবের বাইরে ছিল না। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এবং বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনগুলোর সবাইই প্রায় রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় প্রাণিত ছিল।

প্রায়োগিক ত্রুটি আর বিচ্যুতির কারণে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুছে গেলেও মুক্তিকামী মানুষের কাছে তার প্রেরণাদায়ী ভূমিকাকে মুছে দেওয়া যাবে না। হিটলারের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের বুক চিতিয়ে লড়াই এবং সে লড়াইয়ে জয়লাভের মাধ্যমে দুনিয়াকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেওয়ার ঘটনাকে মুছে ফেলা যাবে না। সর্বোপরি বিপ্লবের মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এবং দক্ষতায় এক উন্নত সংস্কৃতির উন্নত দেশে পরিণত হওয়াই শুধু নয়, নিজেদের দ্বিতীয় বিশ্বশক্তিতে রূপান্তরিত করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যে ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের থেকে তাদের রক্ষা করেছিল, তার স্মৃতি মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বুকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ধারণ করার ফলেই এমনটা সেদিন সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত যুগের অবসানের পর আবার করে নয়া পুঁজিবাদী উপনিবেশবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠছে 'এক মেরু বিশ্ব' স্থাপন করে দুনিয়াকে তার পদানত করে ফেলতে। ভয় হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনরুত্থান এবং দেশে দেশে তার অনুরাগীদের পুনরুত্থান ফের না আর এক হিটলারেরও পুনরুত্থান ঘটিয়ে দেয়। যে ভয়ানক সংকটে এখন পুঁজিবাদ রয়েছে, তার থেকে মুক্তি পেতে দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধের আবহ আর [illegible] অবিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়া [illegible] দরকার এবং সেটা করা হচ্ছে। [illegible] মানুষ। এক দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক ঢালের অভাব, অন্যদিকে যুদ্ধ আর অবিশ্বাসের পরিবেশ— জীবন ধারণই এক বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবই আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছে 'প্রতিকূলতা'কে কি ভাবে 'সুযোগ'এ পরিণত করা যায়, কি ভাবে সঠিক সময়ে নির্ণায়ক ভাবে আঘাত করলে 'মানুষ'এর অগ্রগতির পরিবেশ তৈরি করা যায় এবং তার ফলে সমস্ত ট্রাম্প, পুতিন বা মোদিদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শ বহন করার যে উত্তরাধিকার সোভিয়েত ইউনিয়ন মানুষের ওপর দিয়ে গিয়েছে, তাকে লালন করা শুধু না, আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হওয়া উচিত দেশে দেশে একবিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্তব্য।

আমাদের দেশেও এখন এক চরম দক্ষিণপন্থী সরকার চলছে। এমন এক সরকার, যার পরিচালক দল দাঁড়িয়ে রয়েছে গণহত্যা, জাতি দাঙ্গা, নারী নিপীড়ন আর প্রান্তিক মানুষদের প্রতি হিংসার ওপরে। এমন এক সরকার যে আঁকড়ে ধরে রয়েছে সর্বনাশা নয়া উদারবাদী অর্থনীতিকে। এরা কাজ করছে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে 'হিন্দুত্ব' নামক এক কাল্পনিক মতবাদকে। এটাই ওদের রাজনীতি এবং এর আড়ালে ওরা সার্বিক লুণ্ঠনের এক পরিবেশ তৈরি করছে ঠিক যেমনটা তৈরি হয়েছিল জারের রাশিয়ায়, কাইজারের জার্মানীতে, কুয়োমিনতাং-এর চীনে। দেশে শ্রমিকদের কোনও অধিকার নেই, সংখ্যালঘুদের কোনও অধিকার নেই, আদিবাসী বা দলিতদের কোনও অধিকার নেই, নেই বেশির ভাগ জায়গায় নারীদের কোনও অধিকার— না অন্নের অধিকার, না বস্ত্রের অধিকার, না বাঁচার অধিকার। বছরে গড়ে বারো হাজার চাষী আত্মহত্যা করে এখন এই দেশে। বেকারত্ব চরমে। হু হু করে বাড়ছে দৈনন্দিন জিনিস-পত্রের দাম। সরকার হাত গুটিয়ে বসে আছে অবাধ লুণ্ঠনের ছাড়পত্র দিয়ে।

ঠিক এমন সময়েই দরকার শ্রমিক-কৃষকের চরম ঐক্য। নয়া পুঁজিবাদী আগ্রাসনের যুগে আমাদের দেশ এখনও কৃষি-প্রধান। আমাদের দেশে এখনও ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। 'পুঁজিবাদের চরম বিকাশ ঘটলে বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হয়'—এই ধারনাকে ভেঙে দিয়ে রুশ বিপ্লব দেখিয়েছে পুঁজিবাদের অসম বিকাশ আছে এমন দেশে, যেখানে পুঁজিবাদের শেকল সর্বত্র তেমন মজবুত না, সেখানে শেকলের দুর্বল জায়গাকে বেছে নিয়ে চরম এবং নির্ণায়ক আঘাত হানতে পারলে সে শেকল ভেঙে ফেলা যায়, সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায়। সব পরিস্থিতিই তো আমাদের দেশের সাথে মিলে যাচ্ছে। তাহলে আমরা পারবো না কেন?

আমরা পারবো। আমাদের দেশের মানুষ পারবে যদি সমস্ত লড়াইকে এক করে ফেলা যায়, সমস্ত লড়াইকে একটা নির্দিষ্ট দিশা দেওয়া যায়। এই শিক্ষাই রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লব আমাদের দিয়েছে। আজও সে শিক্ষা প্রাসঙ্গিক। এই শিক্ষা ধারণ করেন বলেই 'লড়াকু' মানুষ ছাত্র-যুব-মহিলাদের লড়াইকে নিজেদের লড়াই বলেই মনে করেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁরা, তাঁরা কিউবা, ভেনেজুয়েলা, প্যালেস্তাইন, বলিভিয়া বা যুগোস্লাভিয়ার লড়াইকে নিজেদের লড়াই বলেই মনে করেন। এই মানসিকতাকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত, খালি সময় বলছে "আর একটু হাত চালিয়ে ভাই, আর একটু হাত চালিয়ে।" যত দ্রুত সম্ভব নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মিছিল আসবে এই পথে। মিছিলের পথ যেন মসৃণ থাকে। খুব দ্রুত একশ কণ্ঠকে হা[illegible] কণ্ঠে [illegible] সমস্বরে আওয়াজ উঠবে "সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!" □

CS CamScanner

এ যুদ্ধ নয়, গণহত্যা

সুমন কান্তি নাগ

এক বছরের অধিক সময় আগে গত ৭ আক্টোবর ২০২৩ হামাসের অতর্কিত আক্রমণের পাল্টা জবাব দিতে ইজরায়েল গাজা আগ্রাসন শুরু করে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেন, পণবন্দীদের উদ্ধার ও হামাসকে ধ্বংস করা না পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। এই নৃশংস যুদ্ধের ফলস্বরূপ ৪১০০০-এরও বেশী ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই শিশু ও মহিলা। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে কম করে হলেও প্রায় দশ হাজার মানুষ। ইজরায়েলের বোমারু বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও কামানের গোলার আঘাতে গাজা ভূখণ্ড এখন ধ্বংশস্তুপ। ''আত্মরক্ষা করার অধিকার'' আজ আক্রান্ত, গাজার সমস্ত হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানীয় জলের পাইপলাইন সহ পরিকাঠামো, নিকাশী ব্যবস্থা, বাড়ি সবই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। অপুষ্টি , অনাহার ও ওষুধের অভাবে ভয়াবহ মহামারি ও সংক্রমণের মুখে এখন সমগ্র গাজার মানবসভ্যতা। ইজরায়েলি বাহিনীর অবরোধে গাজায় কোনোরকম ত্রাণ পাঠানো এখন প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ মানুষ গৃহহীন, মাথার উপরে ন্যূনতম ছাদটাও নেই । জেনেভা ও হেগ কনভেনশনে একটি ন্যায় যুদ্ধের তত্ত্ব আছে, ''যুদ্ধের সময় সৈন্যে-সৈন্যে মারামারি সঙ্গত, কিন্তু সাধারণ নাগরিককে হত্যা বা নিপীড়ন দণ্ডনীয় অপরাধ''। আন্তর্জাতিক এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তবু ইজরায়েলি আক্রমণ অব্যাহত। আজকের গাজা ভূখণ্ডের সাথে তুলনা করা যায় বিগত শতাব্দীর নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের। কিন্তু ইতিহাসের কী বিচিত্র পরিহাস, সেদিনের নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সংগঠিত হত্যালীলার উত্তরসূরীরা আজ হিংসা সংগঠিত করছে গাজা ভূখণ্ডে। তবে ইহুদি বলতে সব ইহুদি নয়, যারা জায়নবাদী, জমি দেশ দখলকারী তারা। এই ইজরায়েলের মধ্যেও অন্য ইজরায়েল আছে, তারা প্রতিবাদী, ব্যতিক্রমী। অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের প্যালিস্তিনিরাও একই ধরণের হিংসার শিকার। এটা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা।

জায়নবাদী কারা, কী তাদের উদ্দেশ্য?

Zionism বা জায়নবাদ এই কথাটার অর্থ হলো, পালেস্তাইনে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপন করার রাজনৈতিক পরিকল্পনা। জায়নবাদ বা ইহুদিবাদ কথাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, উগ্র ইহুদি তাত্ত্বিক বিমবাউমের লেখা থেকে এই শব্দযুগল সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ পরিচিত হয়। জেরুজালেমের মাউন্ট জিওন ইহুদিদের কাছে এক অতিপবিত্র পর্বত। সমগ্র ইহুদি ধর্মালম্বীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র হলো এই

মাউন্ট জিওন। এই জিওনকে উদ্দেশ্য করেই এই আন্দোলনের নাম হয় জিয়োনিস্ট (জায়নবাদী) আন্দোলন। ১৮৯৭ সালে বাসলেতে অনুষ্ঠিত প্রথম জায়নবাদীদের এই সম্মেলনে থিওডর হার্সেল ঘোষণা করেছিলেন,—''জায়নবাদের লক্ষ্য হচ্ছে পালেস্তাইনে ইহুদিদের একটি জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠা''। পরবর্তীতে জায়নবাদীদের পতাকার নীচে সমগ্র ইহুদি জাতিকে একত্রিত করে তোলার লক্ষ্যে তিনটি অংশের মানুষের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজিত হয়। ১. ইহুদি বুর্জোয়া, যারা জোগাবে অর্থ। ২. ইহুদি বুদ্ধিজীবীরা জোগাবে আন্দোলনের আত্মিক শক্তি, ৩. সাধারণ মেহনতী মানুষ দান করবেন তাদের শ্রম । হার্সেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ইহুদিদের সবথেকে বেপরোয়া অংশ, তারপর গরীবরা, তারপর সচ্ছল ব্যক্তিরা এবং শেষে ধনীরা পালেস্তাইনে বসতি স্থাপন করবেন। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রত্যেককে একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতে হবে, যাকে বলা হতো 'সেকেল'। ইহুদিদের মধ্যে যারা এই সেকেল প্রদান করতেন তারাই হলেন জায়নবাদী। এই জায়নবাদীরা শুধু প্যালেস্তাইনে ইহুদিদের ফেরার কথাই বলছেন না, পালেস্তাইনে গত হাজার হাজার বছর ধরে যারা বসবাস করছেন তাদের উৎখাত করার কথাও বলছেন।

পালেস্তাইনে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পিছনে দুটি কারণকে বেছে নেওয়া হয়, ১. ইহুদি ধর্মের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নবী 'মুসা'' কে করা ''ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি'', ২. ইহুদিরা উত্তরাধিকার সূত্রে পালেস্তাইনের অধিকারী। ইতিহাস ও পুরাণের এক অদ্ভুত মিশেলের মধ্য দিয়েই জায়নবাদীরা তাদের প্রচার শুরু করেন।

পালেস্তাইন তুমি কার?

সংশয়পূর্ণ পৌরাণিক অংশকে বাদ দিলে পালেস্তাইনের ইতিহাস ৪০০০ বছরের। তখন সবাই ছিল কোনো না কোনো উপজাতির অংশ। মূলতঃ অ্যাগিয়েন, ফিলিস্তিন আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেমেটিক বা ট্যানিনিকটি উপজাতির বাসভূমি। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এসিরু অথবা হিব্রু উপজাতির মানুষ এখানে আসে। প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্যালেস্তাইনের উত্তর অংশে সওল নামে এক রাজা ইজরায়েল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে, আর দক্ষিণে ছিল ফিলিস্তিনদের রাজ্য জুডাকা। পরবর্তীতে জুডাকার রাজা ডেভিড দুটো রাজ্যকে একত্রিত করে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে জেরুজালেমে। এর পর রাজা হন সলোমন, তার আমলে স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি ঘটে, একই সাথে সাম্রাজ্যও শক্তিশালী হয়। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে অসিরিয় রাজারা প্যালেস্তাইন দখল করেন, খ্রী. পূ. ৫৮৬ সালে বাবিলনের রাজা নেবু কাডনেজার ইজরায়েল দখল করেন। এই সময়েই ইহুদি ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে । জায়নবাদীরা সলোমন ও ডেভিডকে তাদের পূর্বপুরুষ হিসাবে দাবি করেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ৭০ খ্রী. রোম সাম্রাজ্য ইজরায়েল আক্রমণ করে এবং সেই কারণেই ইহুদিরা প্যালেস্টাইন ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

জায়নবাদীদের মতে ইহুদিদের পয়গম্বর মুসা (মোজেস) মিশরের সম্রাটদের অত্যাচারে বিদ্রোহ করে ও ইহুদি ক্রীতদাসদের নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে আসেন ও তিনি 'ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত এলাকায় যাওয়ার লক্ষ্যে মরুভূমি হয়ে প্যালেস্তাইনের (ক্যানন) দিকে রওনা হন, যা ইহুদিদের কাছে মহানিষ্ক্রমণ (Great Exodus) হিসাবেই চিহ্নিত।। 'ঈশ্বরের' নির্দেশিত স্থলে তিনি পৌঁছাতে না পারলে ও ইহুদিদের বড় অংশের কাছে 'ঈশ্বরের' প্রতিশ্রুত এলাকায় যাওয়ার আকাঙ্খাই তাদের জায়নবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে. আজকের পালেস্তাইনকে জায়নবাদীরা দাবি করলেও মুসা বা মোজেস নামক চরিত্রের ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত নয়, এই চরিত্রকে আধুনিক ঐতিহাসিকরা একটি পৌরাণিক চরিত্র হিসাবেই দাবী করেন। কিন্তু সত্য হলো এটাই, মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমির নম্যান্ত উপজাতির অন্য কোনও রক্ত মাংসের মানুষ যা করতে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

প্রসঙ্গ ঃ ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচন

দেবাশীষ রায়

সদ্য সমাপ্ত দুটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জোটের ওপরই মানুষের আস্থার প্রকাশ ঘটলো। ঝাড়খণ্ডে বিপুল জয় পেয়েছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বাধীন জোট। অপরদিকে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বহাল রইল শাসক জোট মহায়ুতি। যদিও ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টার কোনো কসুর করেনি বিজেপি।

ঝাড়খণ্ডে ইন্ডিয়া মঞ্চ-র দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করায় বিজেপির 'বিদ্বেষ বিভাজনের রাজনীতি'র নীতিগতভাবে পরাজয় হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত। আদিবাসী-নিবিড় ঝাড়খণ্ডে বিজেপির প্রচারের মূল সুর ছিল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ইস্যু। বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানরা আদিবাসীদের মাটি, বেটি নিয়ে নিচ্ছে—ভোটপ্রচারে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা এই মন্তব্য করেন। আসামের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রায় এক বছর ধরে ঝাড়খণ্ডে পড়ে থেকে ঠিক যেভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে আসামে সাফল্য পেয়েছিলেন সেভাবেই বাংলাদেশের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের কোনো সীমানা না থাকা সত্ত্বেও সাঁওতাল পরগনায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ইস্যুকে গোটা রাজ্যে ইস্যু বানানোর চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোট প্রচারে ঝাড়খণ্ডে এসে সরাসরি বলেছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা আপনাদের রুটিও ছিনিয়ে নিচ্ছে, বেটিও ছিনিয়ে নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহও একের পর এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা আপনাদের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, আপনাদের ঘরের মেয়েদের বিয়েও করে নিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বাঁটেঙ্গে তো কাটেঙ্গের প্রচারও করেছিলেন। অমিত শাহ ঝাড়খণ্ডে ১৬টি নির্বাচনী সভা করেছিলেন, মোদি ৬টি সমাবেশ, রোড শো করেছিলেন। আদিত্যনাথ করেছিলেন ১৪টি সভা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঝাড়খণ্ডেই পড়েছিলেন এবং প্রচারের সুর একতারেই বাধা ছিল যে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীরা জমি হারাচ্ছেন, রুটি হারাচ্ছেন এমনকি বেটিও হারাচ্ছেন। এর সঙ্গে ছিল বিপুল অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ যা হেমন্ত সোরেন ভোটের আগেই তথ্য দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। হেমন্ত সোরেনের অভিযোগ ছিল আশেপাশের রাজ্য থেকে লোক এনে চুপিসাড়ে বিদ্বেষ প্রচারের জন্য বিজেপি ৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। ৯৫ হাজার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানিয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল অনুপ্রবেশের প্রচার, বিশেষত ঘরের মেয়েদের নিয়ে প্রচার বিজেপির জন্য বুমেরাং হয়েছে। আদিবাসীরা প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপি কি বলতে চায়, আমরা অর্থের লোভে মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছি? ফলে অনুপ্রবেশের ইস্যু সফল হওয়ার বদলে তিনবারের জেতা রাজমহল আসন বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে। সাঁওতাল পরগনায় চার থেকে এক আসনে নেমে এসেছে বিজেপি। আদিবাসী নিবিড় এলাকায় বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে জল-জঙ্গল-জমির অধিকার বাঁচানোর ডাক দিয়েছিল জেএমএম নেতৃত্বাধীন জোট। মোদি সহ বিজেপি নেতারা যখন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে হাতিয়ার করে ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছিলেন সেই সময়ে কল্পনা সোরেন সহ রাজ্যের শাসকদলের নেতৃত্বরা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে আদিবাসীদের দুরবস্থার ছবি তুলে ধরেন। ছত্তিশগড়ে হাসদেও জঙ্গল সাফ করে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ও মণিপুরে আদিবাসী মহিলাদের ধর্ষণের বিষয় নিয়ে চাঁচাছোলা আক্রমণ করেন বিজেপিকে। একই সঙ্গে আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ইডি-সিবিআই দিয়ে জেলে পাঠানোর বিষয়টিও ভোটারদের কাছে নির্বাচনের ইস্যু হয়েছে বলে একাংশের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। পাশাপাশি বিগত পাঁচ বছরে জে এম এম নেতৃত্বাধীন সরকারের জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্প যেমন মহিলাদের একাউন্টে টাকা পাঠানো, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো প্রকল্প মানুষের মধ্যে সদর্থক প্রভাব ফেলেছে। ফলস্বরূপ আদিবাসী সংরক্ষিত ২৮টি আসনের মধ্যে ২৭টি আসনেই বিজেপি পরাজিত হয়। আদিবাসী নিবিড় ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, কোলেহানে সাফ হয়ে গেছে বিজেপি। শুধু আদিবাসী নিবিড় নয়, তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত বা সাধারণ আসনেও বড় জয় পেয়েছে জে এম এম জোট। ৮১ আসনের বিধানসভায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা-৩৪, কংগ্রেস-১৬, আর জে ডি-৪ এবং সিপিআই(এম. এল) ২টি আসনে জয় পেয়েছে। গতবারের থেকে আসন বেড়ে ৫৬টি আসনে জয়লাভ করেছে জে এম এম জোট। অপরদিকে বিজেপিও শক্তিশালী জোট তৈরি করেছিল এজে এস ইউ পি, জে ডি (ইউ), আর জে পি আর ভি প্রমুখ দলকে সঙ্গে নিয়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী নেতা বাবুলাল মারান্ডিকে দলে ফিরিয়ে নিয়ে বিজেপি তাকে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলে গতবারের থেকে কম আসন (২৪টি) পায় বিজেপি জোট। ঝাড়খণ্ডে এবার যেমন রেকর্ড ৬৭.৭ শতাংশ ভোট পড়েছে, তেমনি পুরুষদের থেকে মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছেন। মহিলাদের বিপুল সমর্থন জে এম এম জোট পেয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরে জে এম এম নেতৃত্বাধীন জোটের নেতৃত্বরা বলেছেন, এই জয় আসলে বিজেপির বিভাজন এবং মিথ্যার রাজনীতিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার জয় এবং একইসঙ্গে জল-জঙ্গল-জমির অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের জয়।

মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অবশ্যই চমকপ্রদ, কারণ এই ফলাফলের আভাস না কোনও বুথ ফেরত সমীক্ষায় ছিল, না বিজেপি বা তার শরিক দলের নেতাদের ভাবনার মধ্যে ছিল। সর্বশেষ অষ্টাদশ লোকসভার ফলাফলের নিরিখেও মনে হয়েছিল মহারাষ্ট্রে শাসক জোট 'মহায়ুতি'র সঙ্গে বিরোধী 'মহাবিকাশ আঘাড়ি'র জোরদার লড়াই হতে চলেছে। ফল বেরোনোর পর দেখা গেল, বিরোধী মহাবিকাশ আঘাড়ি কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। বিধানসভার ২৮৮ আসনের মধ্যে মহায়ুতির ঝুলিতেই ২৩৬, অন্যদিকে মহাবিকাশ আঘাড়ি পেয়েছে মাত্র ৪৮টি আসন। বিপুল জয়ে উল্লসিত মহায়ুতি শিবির 'লড়কি বহনি' প্রকল্পই ফলাফলের চাবিকাঠি বলে দাবি করছে। ফল যেদিকে গড়িয়েছে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এবার সম্ভবত বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে না কোনও দল। নিয়ম অনুযায়ী কোনও দলকে মোট আসনের ন্যূনতম দশ শতাংশ আসন পেতে হয়। জোট গড়ে বিরোধী আসনে বসা যায় না। বিরোধী মহাবিকাশ আঘাড়ি ৪৮ আসন পেলেও পৃথকভাবে শিবসেনা (ইউবিটি) ২০, কংগ্রেস ১৫, এনসিপি (এস পি) ১০, সমাজবাদী পার্টি ২ এবং সিপিআই(এম) ১টি আসন পেয়েছে। দাহানু কেন্দ্রে সিপিআই(এম) প্রার্থী বিনোদ নিকোলে পুনরায় জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীকে ৫,১৩৩ ভোটে পরাজিত করে, জয়ী হয়েছেন উদ্ভব থ্যাকারের পুত্র আদিত্য থ্যাকারেও।

রাজনৈতিক মহলের অভিমত মহারাষ্ট্রের এবারের ভোটে অর্থশক্তি, জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি বড় বিষয় ছিল ফসলের দাম পড়ে যাওয়া। প্রথম তিনটি বিষয়ে ভর করেই কিস্তিমাত করেছে বিজেপি জোট। লক্ষণীয় দিক হল ফসলের দাম পড়ে যাওয়ার মতো জ্বলন্ত বিষয়কে ছাপিয়ে গেল সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত এবং অবশ্যই অর্থের দাপট। মধ্যপ্রদেশের 'লাডলি বহিন' প্রকল্পের অনুরূপে মহায়ুতি সরকার চালু করে 'লড়কি বহিন' যোজনা। এই যোজনায় রাজ্যের গরিব মহিলাদের হাতে সরাসরি নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পারিবারিক আয় যাঁদের আড়াই লক্ষ টাকার নীচে সেই সব পরিবারের মহিলাদের মাসিক ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা করা হবে বলেও ভোটের আগে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে। এই প্রকল্প ভোটে 'ফসল' দিয়েছে বিজেপি জোটকে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ এবার মহারাষ্ট্রে পুরুষদের তুলনায় বিপুল পরিমাণে মহিলারা ভোট দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আবার মারাঠাদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষোভকে প্রশমিত করতে বিজেপি জোট সুচারুভাবে ওবিসি সম্প্রদায়কে একজোট করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য মহায়ুতির ২৩৬ আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পেয়েছে ১৩৩ আসন। শিবসেনা (শিন্ডে) ৫৭, এনসিপি (অজিত) ৪১ এবং ছোট চার শরিক পেয়েছে ৫টি আসন। বিজেপি [illegible] রীতি এই অভাবনীয় জয়কে [illegible] র ফসল, মোদির 'এক হ্যা[illegible]ফ হ্যায়' স্লোগানের পক্ষে মানুষের রায় বলে অভিহিত করেছে। অপরদিকে বিরোধী জোটের অন্যতম শরিক সিপিআই(এম) মনে করছে লোকসভা ভোটের ফলের পর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন মহাবিকাশ আখাড়ির নেতৃবৃন্দ। পার্টির নেতৃত্ব অশোক ধাওয়ালে বলেছেন, 'আসন ভাগাভাগি নিয়ে টালবাহানা, বেশি আসনে লড়ার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, ছোট শরিকদের গুরুত্ব না দেওয়াও বিরোধীদের হারার অন্যতম কারণ'। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতি এবং অর্থশক্তির কাছেও হার মেনেছে বিরোধীরা। আবার ভোটদানের হারে রাতারাতি পরিবর্তন নির্বাচন চলাকালীন এবং পরের দিন সকালে নির্বাচন কমিশনের হিসাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় এবারের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। যার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশির বক্তব্য। ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার বলেন, ''নির্বাচনে ভোটদানের হার দ্রুত আপডেট করা হয়, কিন্তু ভোটদানের হারে এই পরিবর্তন দেখে আমি অবাক। গোটা দেশে যেভাবে এই ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ছে তা সকলের মাথার মধ্যে ঢুকে গেলে বিপদ। পুরো ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস জন্মাবে। নির্বাচন কমিশনের উচিৎ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।'' তিনি আরও বলেন, ''ফর্ম ১৭সি-তে প্রতি বুথে যা ভোটদান হয় তার হিসাব রাখা হয়। এটা ওই দিনের তৈরি করা রিয়েল টাইম ডাটা। [illegible] দিন সেই সংখ্যা এত বদলে যায় তা আমি বুঝতে ব্যর্থ।'' □

CamScanner

উপাসনাস্থল আইন ও সুপ্রিম কোর্ট

বিদ্যুত দাস

গত ১২ ডিসেম্বর '২৪ উপাসনাস্থল আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি পি ভি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনকে নিয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানান, ধর্মীয় স্থান নিয়ে দেশের সমস্ত আদালতে যাবতীয় বিচার প্রক্রিয়া এখনকার মতো বন্ধ থাকবে অর্থাৎ মসজিদ-মাজার নিয়ে কোনও মামলায় সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। ধর্মীয় স্থানের চরিত্র নিয়ে মামলায় অন্তর্বর্তী বা চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা যাবে না। কোনও উপাসনাস্থল নিয়ে নতুন মামলা নথিভুক্ত করার পদক্ষেপ করা যাবে না। কেন্দ্র সরকারকে এই বিষয়ে বক্তব্য পেশের জন্য চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১১টি উপাসনাস্থল ঘিরে ১৮টি মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় কার্যত স্থগিতাদেশ জারি হল।

প্রসঙ্গত হিন্দুত্ববাদীদের একটি অংশ দেশজুড়ে মসজিদ-মাজারের নীচে মন্দির ছিল বলে জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। অপর অংশটি ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইনটিকেই অসাংবিধানিক দাবি তুলে আইনটি বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে ৬টি আবেদন পেশ করেছে। এই হিন্দুত্ববাদীরা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বালাতে মথুরার শাহি ইদগার নীচে কৃষ্ণ জন্মভূমির দাবিতে মামলা করেছে। আজমেঢ় শরিফ দরগার নীচে শিব মন্দির ছিল দাবি করে মামলা করেছে। সম্ভলের জামা মসজিদের নীচে হিন্দু হরিহর মন্দির ছিল দাবি করে গত ১৯ নভেম্বর নিম্ন আদালতে মামলা করে জনৈক হরিশঙ্কর জৈন। আদালত সমীক্ষার নির্দেশ দেয়। সমীক্ষার দ্বিতীয় দিনে জরিপের সময় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে চারজন যুবকের মৃত্যু হয়।

অযোধ্যায় যখন রামমন্দির গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন তীব্র করা হয়, তখন স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, ‘‘অযোধ্যা তো ঝাঁকি হ্যায়,কাশী মথুরা বাকি হ্যায়।’’ অর্থাৎ ‘‘অযোধ্যা তো শুরুমাত্র, এখনও কাশী মথুরা বাকি আছে।’’ এই স্লোগানের মধ্যে ইঙ্গিত ছিল অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির পর কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদ ও মধুরার শাহি ইদগাহ মসজিদের নীচে মন্দির ছিল এই দাবি তোলা হবে।

সঙ্ঘ পরিবার ও বিজেপি'র ধর্ম নিয়ে প্রাণঘাতী রাজনীতি হল, দেশের বিভিন্ন মসজিদ হিন্দু মন্দির ভেঙে গড়ে তোলা হয়েছে এই কথা প্রচার করে উত্তেজনা ছড়ানো এবং আদালতে মামলা দায়ের করা। মামলার মাধ্যমে জরিপের নির্দেশ হলে আবারও উত্তেজনা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু ভোট সংগঠিত করা।

বাবরি মসজিদ ভেঙে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই স্থানে রামমন্দির নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তাই তারা বারাণসী ও মথুরার ক্ষেত্রে আদালতে মামলা করে। এক্ষেত্রেও মামলাকারী হরিশঙ্কর জৈন। মামলায় জ্ঞানবাপী মসজিদের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তাতে স্থগিতাদেশ দেয়নি। একটি মামলার পর্যবেক্ষণে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বলেছেন, ধর্মীয় স্থানের চরিত্র পরিবর্তন না করা গেলেও ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইনে ধর্মীয় স্থানের চরিত্র নিরূপণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে কোনো মসজিদের নীচে মন্দির ছিল কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে কোনো বাধা নেই। এর ফলে মসজিদের নীচে মন্দির ছিল কি না তা দেখার জন্য আবেদনের সংখ্যা বেড়ে যায়। অথচ ১৯৯১ সালে সংসদে উপাসনাস্থল আইন পাশ হয়। সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে ভারতের সমস্ত ধর্মীয় স্থানের যা অবস্থান ছিল সেই অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না (ধারা ৩ অনুযায়ী)। বাবরি মসজিদকে এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছিল। কারণ সেই সময় এই বিষয়টি বিচারাধীন ছিল। উল্লেখ্য উপাসনাস্থলের চরিত্র বদলের নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আইনে এও বলা হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও মামলা করা যাবে না। এই ক্ষেত্রে অযোধ্যার বিবাদই একমাত্র ব্যতিক্রম থাকবে। ভারতের উপাসনাস্থল (বিশেষ ব্যবস্থা) আইন, ১৯৯১ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন যা ধর্মীয় স্থানগুলোর ধর্মীয় চরিত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল, দেশের ধর্মীয় স্থানগুলোর ইতিহাস বা ধর্মীয় চরিত্রের পরিবর্তন রোধ করা (ধারা ৪ অনুযায়ী)।

উপাসনাস্থল আইনটি পাশের প্রেক্ষাপট হল, বিগত শতাব্দীর আটের দশকের শেষের দিকে বিজেপি-আর এস এস স্লোগান দেয় ‘মন্দির হাম ওহি বানায়েঙ্গে’।

১৯৮৬ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আদেশে রামলালার মন্দিরের তালা খুলে দেওয়ার ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, উত্তেজনা প্রশমনে যে তালা লাগিয়েছিলেন তাঁর দাদু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। রামলালার মন্দিরের তালা খোলার পর উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। বাবরি মসজিদের জমির অধিকার নিয়ে সেই সময় একটি মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। পরবর্তীতে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীর রথযাত্রার মাধ্যমে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়ানোর মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন রুখতে সিপিআই(এম) পার্টির একজন সাংসদ ১৯৯১ সালে একটি বিল লোকসভায় উত্থাপন করেন। এই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালেই কংগ্রেস সরকার লোকসভায় একটি বিল অনুমোদনের জন্য পেশ করে এবং এই বিল অনুমোদনের পর The Places of Worship (Special provision) Act, 1991 বা উপাসনাস্থল আইন (বিশেষ ব্যবস্থা) ১৯৯১ নামে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯১ সালের শেষ দিকেই হিন্দুত্ববাদী শক্তি স্লোগান তোলে ‘‘অযোধ্যা মেঁ জীত হমারী হ্যায়, অব কাশী-মথুরা কী বারি হ্যায়,’’ অবশেষে সমস্ত আইন ভেঙে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিজেপি-আর এস এস-এর নেতৃত্বে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে উন্মত্ত জনতা। বিচারপতি লিবেরহান তদন্ত কমিটি আর. এস. এস-বিজেপি নেতা সহ ৬৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু ওই ধ্বংসস্তূপের ওপর কীভাবে রামমন্দির গড়ে উঠবে তার জন্য মামলা এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যায়। ৯ নভেম্বর ২০১৯ এই মামলার রায় হয়। রায়ে চিহ্নিত দোষীরা বেকসুর খালাস পেল এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারী ট্রাস্ট জমি অধিগ্রহণ করে রামের মন্দির নির্মাণ করা হল এবং রামমন্দিরের তথাকথিত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রহিন্টন নরিম্যান একটি আলোচনা সভায় বলেছেন, ‘‘রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।’’ তিনি জানান যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে অভিযুক্তদের খালাস করেছিলেন যে বিচারপতি, বিশেষ সিবিআই আদালতের সেই বিচারপতি সুরেন্দ্র যাদব অবসরের পর সরকারি পদ পেয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের উপ লোকাযুক্ত পদে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁকে। নরিম্যান আরো বলেছেন যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে বেআইনি বলেছিল সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। তারপরেও সেই জায়গাতেই মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়েছিল। যদিও সুপ্রিম কোর্ট রাম জন্মভুমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায়ে উপাসনাস্থল আইনকে বৈধ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সিরিয়ার রাজনৈতিক পালাবদল—নেপথ্যে কি মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র বদলের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি

দীপঙ্কর বাগচী

৮ই ডিসেম্বর, ২০২৪, রবিবার সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের দখল বিদ্রোহী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) বাহিনীর হাতে যাবার মধ্য দিয়ে সিরিয়া আরেকবার রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী হল। গোটা বিশ্ব দখলের আগেই সপরিবারে দামাস্কাস ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন রাষ্ট্রপতি বাশার আল-আসাদ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সিরিয়ায় ক্ষমতায় ছিল আসাদের পরিবার। এইচ টি এস-এর দামাস্কাস দখল সিরিয়ায় আসাদ পরিবারের পাঁচদশকের শাসনেরই শুধু নয়, বাথ পার্টির প্রভাবেরও সমাপ্তি ঘটিয়েছে। যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বাহিনীর হাতে আসাদ সরকারের পতন ঘটেছে তার নেতৃত্বে রয়েছে পূর্বতন আল-কায়েদা কমান্ডার আবু মোহম্মদ আল জোলানির মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী। আসাদের নেতৃত্বাধীন বাথ পার্টির পতন বাস্তবে আরব ভূখণ্ডের এই দেশটিই শুধু নয়, সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার ভবিষ্যৎ ঘিরেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

বাথ পার্টি একটি প্যান-আরববাদী রাজনৈতিক দল। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাথ পার্টি'র অন্যতম শ্লোগান ছিল ‘‘ঐক্য, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র’’, এই দলের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলিতে পড়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সিরিয়া। এই দল সিরিয়ায় ১৯৬৩ সাল থেকে গত ৮ ডিসেম্বর আসাদ সরকারের পতন অবধি এবং ইরাকে ১৯৬৮ থেকে ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনের পরাজয় পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দল ছিল। এই বাথ পার্টি আপাতভাবে কিছুটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির পক্ষেই সওয়াল করে থাকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সুরক্ষানীতি, কৃষকদের মধ্যে জমির বন্টন, পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা বলে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার অন্যতম সমর্থক এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দখলদারির পথে অন্যতম বাধা সিরিয়ার সরকারকে সরিয়ে দিতে তৎপরতা শুরু হয় ২০১১ সালে তথাকথিত ‘আরব বসন্ত’ শুরু হওয়ার পর থেকেই। এইসময় সিরিয়াতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আইসিস এবং আল-কায়েদার মতো সন্ত্রাসবাদী শক্তি।

সিরিয়ায় আসাদ জমানার পতনকে এই অঞ্চলের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামরিক রসায়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল হবে। আসলে এই মুহূর্তে সিরিয়ায় যা ঘটছে তা বোঝা মোটেও শক্ত নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ‘নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা’ গড়ে তোলার নামে বিভিন্ন দেশকে টুকরো টুকরো করা। বিশ্বকে অগুনতি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করাই পশ্চিমি পুঁজিবাদী দুনিয়ার লক্ষ্য। সিরিয়ার আসাদ সরকারের ওপর আক্রমণ একটি পরিকল্পিত বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ, যার নাম ‘আরব বসন্ত’। সিরিয়ায় হস্তক্ষেপ এবং জেহাদীদের আধিপত্য বিস্তার আসলে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইজরায়েল, তুরস্কের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে আরেকটি ধাপ। প্যালেস্তাইনের জনগণের উপর আক্রমণ, লেবাননের জনগণের উপর আক্রমণ, ইরানকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করার মতো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই অংশ এটি।

আসাদ সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে সারা বিশ্বে লাগাতার প্রচার করে আসছে সি আই এ। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়ায় সরাসরি বিমান হামলার কথা বলে সেই ২০১১ সালে, কিন্তু রাশিয়া ও চীনের ভেটো দেবার জন্য তিন তিনবার সেই পরিকল্পনা আটকে যায়। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সিরিয়ার প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা গৃহযুদ্ধের ফলে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর হাতে চলে আসে। কিন্তু সেসময় রাশিয়া এবং ইরান সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোকে কোণঠাসা করে দেয়।

তবে এরপর এক নতুন সমস্যার শুরু হয়। বর্তমান আসাদ সরকার বাথ পার্টির চিরাচরিত সমাজতন্ত্র ঘেঁষা নীতি থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকে নিজেদের প্রতিরোধের ভিত্তি করার পরিবর্তে এই সরকার ধনী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার প্রতি অধিক নজর দিতে শুরু করে। সোজা ভাষায় বললে তথাকথিত উদার অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। এই সময় থেকেই গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত সিরিয়ায় এমন কোনও অর্থনৈতিক নীতি নেওয়া হয়নি যা ছিল শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে। পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত উদার অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের ফলে সাধারণ জনগণের জীবন জীবিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে এবং ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যে ক্রমশ হতাশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আমেরিকার একাধিক নিষেধাজ্ঞার কারণে বাশার আল-আসাদ সরকারের চরম আর্থিক সংকট। এই পরিস্থিতি সিরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সক্রিয় থাকা জেহাদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। এই ডিসেম্বরে সিরিয়ায় আসাদের পতন কিছুটা অবধারিতই ছিল। কারণ পরিস্থিতি একেবারেই ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। প্যালেস্টাইনের গাজায় ইজরায়েলের আগ্রাসনের পর তেল আভিভ সিরিয়ায় যে বিমান হানা চালিয়েছে, তা আসাদের সশস্ত্র বাহিনীকে দুর্বল করেছে। লেবাননে হিজবুল্লা ব্যস্ত ছিল ইজরায়েলের সাথে যুদ্ধে। ফলে আসাদ পায়নি হিজবুল্লার সহায়তা। ইরান তার অফিসারদের হারিয়েছে সিরিয়ায়। তেহেরান তাই পিছিয়ে গিয়েছে। রাশিয়া ব্যস্ত ইউক্রেনের সাথে চলা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ নিয়ে। আসাদ-জোটের এই দুর্বলতা এইচ এস টি-র কাছে এনে দিয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এইচ এস টি-সহ অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর দামাস্কাসে পৌঁছোতে সময় লেগেছে মাত্র বারো দিন। কারণ আসাদ-বাহিনী কার্যত ভেঙে পড়েছিল।

কোনও একটি ঘটনা ঘটার পর থেকে কে বা কারা কতটা লাভবান হল, তা দেখেই বোঝা যায় সেই ঘটনার আসল উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কী। সিরিয়ায় আসাদের পতনের পর দেখা গেল, সিরিয়া ও ইজরায়েল সীমান্তের গোলান মালভূমি ১৯৭৪ সালের চুক্তি ভেঙে ইজরায়েল সেনা দিয়ে দখল করে নিল। এখানেই না থেমে লাগাতার একতরফা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। সিরিয়ার প্রতিরক্ষার সব ক্ষেত্রগুলো ইজরায়েল প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে; বন্দর, সেনাঘাঁটি, অস্ত্রাগার, গবেষণাগার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, ইজরায়েল যা করছে তা ভবিষ্যতে নিজেদের সুরক্ষিত করার জন্যই। তবে যেটা উনি লুকিয়ে রাখছেন সেটা হল আমেরিকার নির্দেশে বৃহত্তর ইজরায়েল গঠন করা হচ্ছে সিরিয়ার পশ্চিম দিকের ব্যাপক অংশ বিনা বাধায় কেড়ে নিয়ে, ঠিক যেমন প্যালেস্তাইনের নব্বই ভাগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের এর পরের লক্ষ্য ইরান ও তার বিপুল তেল ভাণ্ডার। আসাদকে সাহায্য করার মাধ্যমে ইরান ইজরায়েল সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। রাশিয়ার যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ সিরিয়ার বন্দরে অবস্থান করে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবস্থান জানান দিয়েছিল। কিন্তু আসাদের পতনের পর ওই অঞ্চলে ইরান ও রাশিয়ার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে আসবে।

সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতি ইজরায়েলের কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির বিষয় ছিল। ইরানি মিলিশিয়ারা শুধু সন্ত্রাসীদের কোণঠাসাই করেনি, একই সঙ্গে লেবাবনের হিজবুল্লাহদেরও সহায়তা করত। ইরান থেকে লেবাননে হিজবুল্লাহর সামরিক সরবরাহের মূল পাইপলাইন ছিল সিরিয়া। আসাদের পতন ঘটিয়ে ইজরায়েল সফলভাবে হিজবুল্লাহর সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। জিলানির তাহরির আল-শামের শেষ ঘোষণায় বলা হয়েছিল, সিরিয়া থেকে ইরানের সব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে বিতাড়ন করার কথা। ইজরায়েলেরও লক্ষ্য ছিল সিরিয়া থেকে ইরানকে বিতাড়ন করা। আমেরিকা হলো এদের দু'জনেরই প্রভু।

আমেরিকা একসময় আফগানিস্তানে সোভিয়েতের প্রভাব খর্ব করার জন্য গঠন করেছিল আলকায়দা ও তালিবান। সিরিয়াতে প্রথমে আইএস, আল নুসরা আর এখন নাম বদলে আল শামকে দিয়ে একই কাজ করালো আমেরিকা। এখন দেখার ইরাক এবং লিবিয়ার মতো, যেসব দেশের তেলকে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা, সিরিয়া কি হতে চলেছে সেই তালিকায় নতুন দেশ! কারণ, এটাই আমেরিকার ঘৃণ্য বিদেশনীতি তথা দুনিয়া দখলদারির প্রকৃত রূপ।

আসাদ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল, দেশের মানুষগুলো কোথায় যাবেন! তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন সিরিয়ার জনগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে কি অবস্থান নেবে! তাঁরা কি সামনে এগিয়ে এসে ঘটনার অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করবে, যা দেশকে এক মৌলিক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে দেবে? নাকি তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে [illegible] পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। এই দুই প্রশ্নের মধ্যে এইমুহূর্তে নিহিত রয়েছে [illegible]৫ লক্ষ সিরীয় জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যত। ইতিহাস বলে [illegible]ঙ্গি ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং দেশকে রক্ষা করা অসম্ভব। □

CS CamScanner

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

এ যুদ্ধ নয়, গণহত্যা

পারেনি, পৌরাণিক মোজেস তা পেরেছেন, ইহুদিদের চিন্তা চেতনায় তিনি রয়ে গিয়েছেন।

তাহলে ইতিহাস কী বলে? অভিবাসন পৃথিবীতে নতুন কোনো ঘটনা নয়। কেউ হঠাৎ করে কোথাও উপস্থিত হয়ে কয়েক শতাব্দী বা হাজার বছরের অধিবাসীদের উৎপাটন করে তাদের জমিকে নিজেদের পূর্বপুরুষদের জমি বলে দাবি করতে পারে না। পূর্বপুরুষ খুঁজতে কোথায় যাবো? তাহলে তো আফ্রিকায় যেতে হয়, কারণ আজকের যে আধুনিক মানুষকে আমরা দেখছি তাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে আফ্রিকায়, এবং আজ থেকে ২ লক্ষ বছর আগের আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে প্রথম পরিযানের মাধ্যমে ইউরোপ ও এশিয়া সহ বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজ প্রতিষ্ঠিত। এই পর্বের পরিযানের শেষে আফ্রিকা থেকে যে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' পরিযানের মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপে যায় তারা পরবর্তীতে লুপ্ত হয়। যদিও এই প্রজাতির দাঁত সহ চোয়াল ও জীবাশ্ম, সাতজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ এবং তিনজন শিশুর দেহাবশেষ শুষ্ক ইজরায়েলের গুহায় পাওয়া যায়। এটা কীভাবে বলা যায় যে এই প্রজাতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল? প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, পারবেন জিনবিদ্যা বা জেনেটিক্স বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা। আজ থেকে অনেক পরে এরও প্রায় ৭০০০০ থেকে ৮০০০০ বছর আগে আফ্রিকা থেকে প্রথম সফল পরিযান ঘটে আধুনিক মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্সের)। একদল যায় ইউরোপের দিকে অপর দল যায় এশিয়ার দিকে। সমস্ত পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের এই প্রজাতির ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে আজকের মানব প্রজাতির পূর্বসূরী হিসাবে এরাই চিহ্নিত। আর এই পরিযানের সময় মধ্যপ্রাচ্যের এই শুষ্ক প্রান্তরকে পার করতে হয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্সদের প্রায় প্রতিটি গোষ্ঠীকেই। তাই কে দাবি করবে পালেস্তাইনের এই জমির প্রকৃত উত্তরাধিকার?

কেন এই বীভৎসতা?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বে যখন পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, সেই পর্বে পশ্চিম এশিয়ায় আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে বৃটিশ-মার্কিন যৌথ পরিকল্পনার ফসল এই ইজরায়েল রাষ্ট্র। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে ইহুদি নিধনের সহানুভূতির ঝড় এবং রাষ্ট্র সংঘের প্রস্তাবকে ব্যবহার করে আরব দেশগুলির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালের ১৫ মে গড়ে তোলা হয় ইজরায়েল রাষ্ট্র। নতুন এই রাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রথম দিনেই তাকে স্বীকৃতি দেয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান। প্রতিষ্ঠার পর দিন থেকেই ইজরায়েল আন্তর্জাতিক আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বারে বারে আরব দেশগুলি ও পালেস্তিনিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। ভূমি দখল করেছে পালেস্তাইন, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের। মূলতঃ এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের সংযোগস্থলের তেল ও মূল্যবান খনিজ সম্পদে ভরপুর এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখলদারী এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শক্তিশালী করা হয় ইজরায়েলকে। আসলে মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন ও ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের স্যাটেলাইট রাষ্ট্র হিসাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যেই গড়ে তোলা হয় ইজরায়েলকে। ফ্রেডি ট্রুম্যান থেকে জর্জ বুশ, বারাক ওবামা, ডোনাল্ড ট্রাম্প, জো বাইডেন হয়ে আজকের ডোনাল্ড ট্রাম্প সকলেই বিপুল পরিমাণ আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করে চলেছে ইজরায়েলকে। বর্তমান ইজরায়েলের ৬৯ শতাংশ যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে আমেরিকা, ইজরায়েলের মোট যুদ্ধাস্ত্রের ৮০ শতাংশ অস্ত্রই আসে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি থেকে। মাত্র ২০ শতাংশ অস্ত্র তৈরী করছে ইজরায়েল নিজে। আমেরিকায় নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, যেই সরকারেই থাকুক ইজরায়েলের প্রতি মার্কিন সাহায্য অব্যাহত থাকে।

সর্বোপরি, ২০০৮ সাল থেকে ধনতন্ত্রের সংকট মোকাবিলার জন্য আমেরিকা ও পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সামনে এখন কোনো বিকল্প রাস্তা নেই, একটাই অস্ত্র রয়েছে আর তা হলো যুদ্ধ অর্থনীতি। তাই আমেরিকার নির্বাচনে যাই ঘটুক না কেন, ডেমোক্রাট বা রিপাবলিকান যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন বিশ্ব জোড়া আধিপত্য কায়েম রাখতে এবং অর্থনীতিকে সচল রাখতে যুদ্ধ অর্থনীতিকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু ইজরায়েল নয়, ইউক্রেন বা তাইওয়ান সর্বত্রই এই রাজনীতির প্রভাব। আর, আমেরিকার বলে বলীয়ান হয়ে ইজরায়েল গাজা আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় শুরু করেছে এক বৃহত্তর যুদ্ধ। যে যুদ্ধে যুক্ত হয়ে পড়েছে ইরান, লেবানন, মিশর, সিরিয়া, জর্ডন সহ প্রায় সমস্ত আরব দুনিয়াই।

কিন্তু এই যুদ্ধে কি ইজরায়েল পারবে হামাস নিধনের নামে সমগ্র পালেস্তিনি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে? পরিস্থিতি বলছে তা হওয়ার নয়। কারণ সমগ্র বিশ্ব জুড়েই আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির আধিপত্য আজ চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক-বাণিজ্যিকভাবে ও প্রযুক্তিগতভাবে চীনের উত্থান এবং চীনের ইরান, সৌদি আরব, মিশর, কাতারের মতো দেশগুলির কাছে বিকল্প হয়ে ওঠা, ব্রিকস-এ ইরান, সৌদি আরব, ইউ এ ই, মিশরের সদস্য হওয়া, এমনকি ন্যাটোর সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও তুরস্ক ব্রিকসের সদস্য হয়েছে। গাজা ও লেবাননের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের সংগঠিত আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন সাহায্য বন্ধের দাবিতে ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, তুরস্ক সহ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। একই জনমত প্রবল হচ্ছে সমগ্র দুনিয়াজুড়ে, তারই অংশ হিসাবে আমাদের দেশের অভ্যন্তরের প্রগতিশীল অংশের মানুষও প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে। ☐

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

উপাসনাস্থল আইন ও সুপ্রিম কোর্ট

ঘোষণা করে বলেছিল, এই আইন আমাদের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের কথা বলেছে। উপাসনাস্থলগুলির চরিত্র রক্ষায় কোনো অস্পষ্টতা না রেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর নিপীড়ন চালানোর হাতিয়ার হিসাবে ইতিহাস ও তার ভুলগুলিকে ব্যবহার করা যাবে না। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বাবরি মসজিদ রায়ের অন্যতম কারিগর। তিনি অবসরের কিছুদিন আগে বিবৃতি দিয়ে বলেন, রায় দেওয়ার আগে দ্বিধায় পড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তাতেই সমাধান সূত্র পেয়ে যান।

গত চার বছর ধরে উপাসনাস্থল আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে ছ'টি মামলা হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি'র প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মন্যম স্বামী, আর এস এস ঘনিষ্ঠ আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। আইনের ২, ৩ ও ৪ ধারা বাতিল করার আবেদন জানিয়েছেন উপাধ্যায়।

একইসঙ্গে উপাসনাস্থল আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগের আরজি নিয়ে মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছে সিপিআই(এম), মহারাষ্ট্রের এনসিপি বিধায়ক জিতেন্দ্র সতীশ আওহাদ। আর.জে.ডি. সাংসদ মনোজ কুমার ঝাঁ, ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগের সাংসদ মহম্মদ বশির, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ ও মথুরার শাহীঈদগা মসজিদের দুই পরিচালন কমিটি এবং প্রায় ৩০ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা, শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ।

আবেদনগুলির শুনানির জন্য গত ৭ ডিসেম্বর বর্তমান প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারপতির একটি টিম গঠন করা হয় এবং গত ১২ ডিসেম্বর রায়দান করা হয়। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা, একটি হিন্দু গোষ্ঠীর আইনজীবী জে সাই দীপক। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি বিশ্বনাথন রায়ের মর্মবস্তু তুলে ধরেন।

প্রধান বিচারপতি আরো জানান কেন্দ্র সরকারকে চার সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে আইনটি সম্পর্কে তাদের অবস্থান জানানোর জন্য। কেন্দ্রের হলফনামার প্রেক্ষিতে মামলার সমস্ত পক্ষ নিজেদের বক্তব্য আদালতে পেশ করার জন্য আরও চার সপ্তাহ সময় পাবে। আট সপ্তাহ বা দুই মাস পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে মোদি সরকার এই চার সপ্তাহের মধ্যে আইনটি সম্পর্কে তাদের অবস্থান আদৌ জানাবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। কারণ গত ২০২০ সালে এই আইনটির বিরুদ্ধে মামলায় কেন্দ্রকে হলফনামা জমা দিতে বলেছিল শীর্ষ আদালত। মোদি সরকার তা জমা দেয়নি। বরং একাধিকবার সময় চেয়ে নিয়েছে।

উপাসনাস্থল আইন, ১৯৯১ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন যা দেশের ধর্মীয় স্থানের সংরক্ষণ, সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের আশা উপাসনাস্থল আইনটি রক্ষায় শীর্ষ আদালত আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। ☐

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

১৩ দফা দাবিতে অবস্থান ও কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচী

বলছে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। কিন্তু শাসকদলের কিছু মন্ত্রী, সাংসদরা ঘৃণ্য ভাষণ দিয়ে চলেছেন। একই সঙ্গে দেশের সরকার নির্লজ্জভাবে কর্পোরেটদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। মালিক পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে দেশের জমি শুধুমাত্র কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে তাই নয়, শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে শ্রমকোড নিয়ে এসেছে। কৃষকের শস্যের ন্যূনতম লাভজনক মূল্যের দাবিতে এবং শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জীবনদায়ী ওষুধের প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, অবসরপ্রাপ্তদের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে কিন্তু ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নিশ্চুপ সরকার। আমাদের রাজ্যে প্রশাসনের অভ্যন্তরে হুমকি, থ্রেট কালচারের সম্মুখীন আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরেই হয়ে চলেছি। প্রশাসনের অভ্যন্তরে Recruitment-এ দুর্নীতি, সাদা

অনাদি সাহু

খাতায় চাকরি, যোগ্যরা বঞ্চিত হয়ে রাজপথে বসে রয়েছেন খোলা আকাশের নিচে, মন্ত্রীরা জেলে যাচ্ছেন সিবিআই, ইডি, সিবিআই-এর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে। রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতির যে সর্বগ্রাসী বিস্তার ঘটেছে R G Kar-এর ঘটনা এই সমস্ত কিছুরই অঙ্গ। জুনিয়র ডাক্তাররা মেরুদণ্ড সোজা করে লড়াই করেছেন, প্রশাসনের মেরুদণ্ডহীনদের নামিয়ে এনেছেন। সিনিয়ার ডাক্তাররা সহ এক বিপুল অংশের মানুষ এই লড়াইতে সামিল হয়েছেন। আমরা ও প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীরা লাগাতার লড়াইতে রয়েছি। শুধুমাত্র একদিনের অবস্থান নয় প্রয়োজনে লাগাতার অবস্থানে যেতে হবে। দীর্ঘদিন নিয়োগ নেই। প্রশাসনের অভ্যন্তরে ৬-৭ লক্ষ শূন্যপদ বেতনভাতা প্রতিদিন লুঠ করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা। মহার্ঘ রিলিফ বকেয়া রাখার মধ্য দিয়ে। গোটা ভারতবর্ষের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পান। কারণ এটা Service Rule-এ লেখা আছে। কিন্তু এই দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হলেই বিষদগার চলছে, কর্মচারীদের কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে। R G Kar-এর ঘটনার পর সাময়িকভাবে আমরা আমাদের দাবিকে সরিয়ে রেখেছি, তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজপথে আন্দোলনে সামিল হয়েছি। আমাদের পরিবারের লোকজনও যুক্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে গরিব মানুষের ত্রিপল-চাল-ডাল চুরি নয়তো লুঠ চলছে। আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে, গরিব মানুষ ঘর পাচ্ছে না, অপরদিকে যার পাকা বাড়ি আছে তিনি পুনরায় টাকা পাবেন এমন তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা বলছি উপভোক্তা নির্বাচন সঠিক হচ্ছে না। মানুষকে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এ দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে। ১৩ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই সমাবেশ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি মূল ১৩ দফা দাবি প্রস্তাব পাঠ করেন।

পরবর্তীতে দাবি প্রস্তাবের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তারা বক্তব্য পেশ করেন। রতন ভট্টাচার্য (কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) বলেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলনে অন্যরা উৎসাহিত হয়। আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আর জি কর নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠলেও অরাজনৈতিক আন্দোলন বেশিদিন টেকে না। আমরা কর্মসূচীকে প্রকৃত আন্দোলনের রূপ দিতে পারছি না। সুসংবদ্ধ ভাবে একযোগে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের পরিবর্তনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সমাবেশকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অঞ্জন ঘোষ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ) বলেন গোটা দেশ ও রাজ্যে চরম সামাজিক বৈষম্য চলছে। আজ এ কোন সকালে আমরা রয়েছি, যা রাতের চেয়েও অন্ধকার। চেতনার মশাল হয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। যৌথ মঞ্চকে আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দিতে হবে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিও তিনি করেন।

বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সমাবেশে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কারণ তারা জনগণের স্বার্থে কাজ করেন। জনগণের স্বার্থরক্ষা ছাড়া রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্য কোনও স্বার্থ থাকতে পারে না। গোটা রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সর্বত্র দুর্নীতি বিরাজ করছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলা। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই যেমন চলবে একই সঙ্গে রাস্তার আন্দোলনও জারি রাখতে হবে। রাজ্য সরকারের

দেবদূত ঘোষ

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির দোসর হিসাবে কাজ করছে কেন্দ্রের সরকার। কারণ দুর্নীতি বিষয়ে একে অপরের পরিপূরক। তাই সিবিআই, ইডি কোনো দুর্নীতির মামলাতেই উৎসস্থলে যেতে চাইছে না। আর জি কর কাণ্ডে উত্তাল আন্দোলন তৈরি হল গোটা রাজ্যজুড়ে, কিন্তু রাজ্য সরকার ব্যস্ত থাকল ধর্ষণ-খুনীদের আড়াল করতে। এর জন্য জনগণের করের টাকায় তারা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেছে যাতে দুর্নীতির মাথারা ছাড় পেয়ে যায়। এখানেও একইরকমভাবে রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসকদল একযোগে এই আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চরছে, ঘটনার গুরুত্বকে লঘু করতে চাইছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রকৃত শাস্তি দিতে হলে আইনি লড়াইয়ের সাথে রাস্তার আন্দোলনকেও [illegible] করতে হবে। রাস্তার [illegible]নের মধ্য দিয়েই রাজ্য ও [illegible]শাসককে বাধ্য করতে হবে মানুষের স্বার্থে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের। না হলে তাদের টেনে নিচে নামিয়ে দিতে হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বিগত দিনেও সেই ভূমিকা প্রতিপালন করেছেন, আগামী দিনেও সেই ভূমিকা পালনে তাদের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, আপনারা আপনাদের দাবিকে ধর্মতলায় সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এর জন্য আপনাদের অভিনন্দন। শুধুমাত্র নিজ দাবি নয়, অভয়ার বিচার, আবাস যোজনার দুর্নীতি, রাজ্য সরকারের হাতে থাকা ট্রাম কোম্পানি সহ বিপুল জমি বেসরকারী উদ্যোগপতিদের হাতে দেওয়ার বিরুদ্ধে দাবি সহ সাধারণ মানুষের দাবিকে আপনারা শুধু যুক্ত করেছেন তা নয়, তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যা সময়ের দাবি। রাজ্যে বিগত ১৩ বছর ধরে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার আক্রান্ত। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বদলী, হুমকি দেওয়া চলছে। দেশেও স্বাধীনতা পরবর্তীতে রেকর্ড বেকারী, ১০ লক্ষ পদ শূন্য কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলোতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ; তা পূরণের পরিবর্তে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেটদের হাতে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সন্দীপ রায় (সাধারণ সম্পাদক পঞ্চায়েতে যৌথ কমিটি) বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এমন এক ঐতিহ্যশালী সংগঠন যারা কর্মচারী আন্দোলনে ঐতিহাসিকভাবেই দিক নির্দেশ করেছে। দীর্ঘদিন আমাদের একই সঙ্গে পথ চলা, এক সঙ্গে লড়াই সংগঠিত করা হয়েছে। অভয়ার বিচারের দাবিতে সর্বশেষ জনচেতনা মঞ্চের কর্মসূচী, সেদিনও কোর্টের আদেশে আমাদের সমাবেশ হয়েছিল। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অপরদিকে চার্জশিট না দেওয়ায় অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসছে। আবাস যোজনায় চূড়ান্ত দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে থ্রেট কালচার চলছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনই একমাত্র পথ। সমাবেশকে অভিনন্দিত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা রূপক মুখার্জী বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিটি লড়াই আন্দোলনের পাশে রয়েছি আমরা। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ওপরও আক্রমণ নেমে আসছে। শ্রমকোড চালু করার মধ্য দিয়ে ১২ ঘণ্টা কাজের সময় করার চেষ্টা চলছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অনুপম রায়

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

সমাবেশকে কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সক্রিয়তা অভিনন্দনযোগ্য। অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজপথের আন্দোলনে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও যুক্ত ছিল। রাজ্য সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি পাহাড়প্রমাণ, শিক্ষা দপ্তরেও বিপুল দুর্নীতি রয়েছে। বিশিষ্ট অভিনেতা দেবদূত ঘোষ বলেন, রাজ্যজুড়ে লুঠের সিন্ডিকেট চলছে। এর বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন গড়ে [illegible] রক্ষা

● সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

CS CamScanner

রেলে ইউনিয়নের স্বীকৃতির নির্বাচনে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশাল জয়

প্রবল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে রেল ইউনিয়নের স্বীকৃতির নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করলো ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন (ERMU)। একই সাথে মেট্রো রেলে MRMU এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলে SERMU এককভাবে জয়ী হয়েছে। সাউথ ডিভিশন ও নর্দার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলেও বাম-গণতান্ত্রিক ইউনিয়নগুলি জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস অনুমোদিত ERMC দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। গত ৪, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর গোটা দেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ডিসেম্বর ভোট গণনা হয়। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই রেলের শ্রমিক-কর্মচারীরা আনন্দে মেতে ওঠেন এবং একে অপরকে লাল আবিরে রাঙিয়ে দেন।

ইস্টার্ন রেলে এই নির্বাচন বাংলা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশকে নিয়ে হয়। গোটা ইস্টার্ন রেলে ERMU ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়। গোটা পূর্ব রিজিয়নে তারা ৩৩ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়। শিয়ালদহ ডিভিশনে ERMU ১৮৭৫ ভোটে জয়ী হয়। কাঁচড়াপাড়া, লিলুয়া, ব্যান্ডেল, হেড কোয়ার্টারস ও খড়গপুরেও ERMU বিপুল ভোটে জয়ী হয়। অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনগুলি ২০১৩ সালের নির্বাচনে শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। দীর্ঘ ১১ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ERMU আগের মতোই আবার জয়ী হল। ERMU প্রথম স্থানের অধিকারী হওয়ার পর তাদের সাধারণ সম্পাদক অমিত কুমার ঘোষ বলেন, ব্যাপক সন্ত্রাস মোকাবিলা করে এই নির্বাচনে লড়তে হয়েছে। এইরকম রাজনৈতিক আক্রমণ রেলের নির্বাচনে অতীতে কখনও হয়নি। বহু জায়গায় আমাদের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। কিছু জায়গায় কাউন্টিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও রেলের শ্রমিক-কর্মচারীরা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন। এই নির্বাচনে বহু নেতৃত্ব ঘরছাড়া ছিলেন। ১৯২০ সালে এই ইউনিয়নের গঠনের পর থেকেই রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের পাশে থেকে ERMU লড়াই-আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এই লড়াইকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আরও ঐক্যবদ্ধ লড়াই প্রয়োজন। রেলশিল্পকে বাঁচানোর লড়াইতে সমস্ত রেল শ্রমিক-কর্মচারীকে আরও একজোট হতে হবে। অন্যান্য ইউনিয়নের সন্ত্রাস, অপপ্রচার ও কুৎসায় বিভ্রান্ত না হয়ে রেল শ্রমিক-কর্মচারীরা ERMU-এর প্রতি যে আস্থা রেখেছেন, তার জন্য সাধারণ সম্পাদক তাঁদের অভিনন্দন জানান।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ইউনিয়নের স্বীকৃতির নির্বাচনে একমাত্র ইউনিয়নের স্বীকৃতি পেল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন (SERMU)। শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রদত্ত ভোটের মোট ৩৭.৫১ শতাংশ পেয়েছে SERMU। ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেস অনুমোদিত সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস কংগ্রেস (SERMC) স্বীকৃত ইউনিয়নের মর্যাদা হারিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদিত ইউনিয়নের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এই নির্বাচনে। বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ নিয়ে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের এই নির্বাচন। আদ্রা, চক্রধরপুর, খড়গপুর, খড়গপুর ওয়ার্কশপ, রাঁচি, হেড কোয়ার্টার সহ সব ডিভিশনেই জয়ী হয় SERMU। ২০১৩ সালে শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনে SERMC ও SERMU দুটি ইউনিয়নই স্বীকৃত ইউনিউয়নের মর্যাদা পেয়েছিল। SERMU একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়নের স্বীকৃতি পাওয়ায় SERMU-এর সাধারণ সম্পাদক আশিস মুখার্জী রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিন তিনি বলেন, রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থে একজোট হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রেলকে বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন রেলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এই নির্বাচনে বিপুল জয়ের ফলে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবে SERMU।

মেট্রো রেলওয়ের নির্বাচনে জয়ী হয় বাম-গণতান্ত্রিক মেট্রো রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন (MRMU)। এই নির্বাচনে ৩৩০৩টি ভোট পড়েছে। MRMU সহ চারটি অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ওদিকে, জামালপুর, আসানসোল ও মালদহতে কংগ্রেসের ইউনিয়ন জয়ী হয়। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

কমরেড নরেন গুপ্ত'র প্রয়াণ দিবস প্রতিপালিত

প্রতি বছরের মতো এবছরেও রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড নরেন গুপ্ত'র প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও কমরেড নরেন গুপ্ত স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১১টায় কলকাতার খাদ্যভবন চত্বরে ১১ নং শেডে সমিতি দপ্তরে রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সম্পাদক প্রণব কর এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পরেই রক্তদান করার জন্য উৎসুক কর্মচারীদের লাইন শুরু হয়ে যায়। রক্তদাতাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সমিতির নেতৃত্ব সহ আরো অনেক কর্মচারী সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কর্মচারীদের কয়েকজন নিকট আত্মীয়ও রক্তদান করেন। ৪ জন মহিলা সহ মোট ৩৬ জন রক্তদান করেন। এবছর রক্তদান কর্মসূচির পাশাপাশি চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচিও পালন করা হয়। প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি করে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। রক্তদাতারা ছাড়াও আরো অনেকেই চারাগাছ নেন। ওইদিনই অফিস ছুটির পর ওই একই জায়গায় কমরেড নরেন গুপ্ত স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল "বর্তমান সময় ও ট্রেড ইউনিয়নের ইতিকর্তব্য"। বক্তা ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য। তিনি উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনা করেন, যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। দুটি কর্মসূচিতেই সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার ঘোষ প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এবং সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি উৎসর্গ মিত্র। □

দক্ষিণাঞ্চলের কর্মসূচী

গত ১৭.১২.২০২৪ সার্ভে বিল্ডিং-এ ডি এল আর এস-এর কাছে বিশাখা গাইড লাইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক কমিটি তৈরি করার দাবিতে ডেপুটেশন ও পরবর্তীতে কর্মচারীদের নিয়ে সভা হয়।

গত ১৮.১২.২০২৪ ভবানী ভবন-এ সি এইচ আই এফ এফ ইঞ্জিনীয়ার-এর কাছে বিশাখা গাইড লাইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক কমিটি তৈরি করার দাবিতে ডেপুটেশন ও বিল্ডিং স্কোয়াড ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। □

পেনশন কমিউটেশনের সময়সীমা হ্রাস করার দাবিতে রাজ্যের প্রশাসনকে চিঠি

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/ ০১/২৫ তারিখ ঃ ০৬/০১/২০২৫

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব
অর্থদপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ পেনশন কমিউটেশনের সময়সীমা সংক্রান্ত

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

পেনশন কমিউটেশনের এযাবৎকাল স্বীকৃত সময়সীমা কমানোর জন্য মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি যে রায় (CWP-2490 & 8222 / 2024) প্রদান করেছে, সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এই রায় প্রদান করেছে। কারণ পেনশন কমিউটেশনের ১৫ বছর সময় সীমা যখন ধার্য করা হয়েছিল, তখন ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল ১২ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে সুদের হার হ্রাস পেয়ে ৭ শতাংশের সামান্য বেশি। স্বভাবতই কমিউটেশনের অর্থ পুনরুদ্ধার করতে অতীতে ১৮০ মাস বা ১৫ বছর সময় লাগলেও বর্তমানে ১২৮ মাস বা ১০ বছর ৮ মাসেই তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সুদের হারে হ্রাস প্রাপ্তিকে বিবেচনায় রেখেই সুপ্রিম কোর্ট কমিউটেশনের সময় কমানোর পক্ষে রায় প্রদান করেছে।

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্য কমিউটেশন সম্পর্কিত সংশোধিত আদেশনামা প্রকাশ করেছে। আমাদের রাজ্যে পেনশনারদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা দরকার। ১৫ বছর সময়সীমার পূর্বতন সিদ্ধান্ত বহাল থাকার ফলে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন, ৩৯ শতাংশ মহার্ঘ রিলিফ বকেয়া থাকার ফলে পেনশনাররা প্রতি মাসে যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তার সাথে যুক্ত হচ্ছে বিলম্বিত কমিউটেশনের কারণজনিত আর্থিক ক্ষতি। দুর্মূল্যের বাজারে এই দ্বি-বিধ ধাক্কা একজন পেনশনারকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে পেনশন কমিউটেশনের সময়সীমা কমানোর সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আশা করি পেনশনার্স তথা প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার স্বার্থে রাজ্য সরকার এই বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধন্যবাদান্তে,
ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পরে

১৩ দফা দাবিতে অবস্থান ও কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচী

করার সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। রাজ্যজুড়ে চলছে "এলোমেলো করে দেয়া, লুটেপুটে খাই"-এর যাত্রাপালা। শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু বলতেন "সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না।" কী করলে এই সরকারের পরিবর্তন করা যায় তা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। এল. আই. সি.-এর পক্ষে প্রবীর মুখার্জী বলেন, রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা মানুষের দাবি তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে শীতের রাতে আজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাস্তায়, বীমা কর্মচারীরাও বিগত দিনের মতো আগামী দিনেও যৌথ আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকা পালন করবে। ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে মোহন দাস পণ্ডিত বলেন লড়াই আন্দোলন জারি রাখতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই শাসক দলের বিরুদ্ধে। নির্বাচনে জয়ী হলেও যা খুশি করার অধিকার জন্মায় না। রাজপথের লড়াইকে শক্তিশালী করেই দুই শাসকের বুকে কাঁপন ধরাতে হবে।

এদিনের সমাবেশে অদ্রিজা দাশগুপ্ত-র পরিচালনায় উহিনী কলকাতার পক্ষ থেকে দুটি পথনাটিকা পরিবেশিত হয়। একটি বিশাখা গাইড লাইনকে কেন্দ্র করে, পরবর্তীতে অপর যে নাটকটি পরিবেশিত হয় তার নাম 'ধর্ম'। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সপ্তক সানাই দাস, সুমন চট্টোপাধ্যায় ও সৌহার্দ, রাপুর-রিয়া, অধীন দাস বাউল। আবৃত্তি পরিবেশন করেন দেবাশীষ সিন্হা ও দেবাশীষ কুণ্ডু।

১৩ দফা দাবির রাজনৈতিক গুরুত্ব পেশ করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, আজকে আমাদের এই সমাবেশ করতে যেমন দলদাস পুলিশ বাধা দান করেছে, তেমনি আজকের আমাদের এই সমাবেশ ও তার দাবির বিষয়ে শাসকদলের মুখপাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বলেছেন, রাজ্যে যখন অপরাজিতা আইন আছে, তখন বিশাখা আইন নিয়ে সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন না করে রাজনীতি করছেন। এর আগেও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সময় আমরা দেখেছি মানুষ যখন রাস্তায় নেমেছেন তখন তার মুখ নিঃসৃত বাণী 'প্রেমিক-প্রেমিকারা রাস্তায় নেমেছেন'। আমরা বলছি যার যেটা রুচি সে সেটাই বলে। আমরা দেখেছি মানুষ রাস্তায় নেমেছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন আর সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায় বিচারের বদলে মানুষকে উৎসবে ফেরার ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখলাম আর জি কর ঘটনার মূল চক্রীদের পেছনের রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে পুলিশ কর্ডন করে মেডিকেল কাউন্সিলে নিয়ে যাচ্ছে। যারা সর্বত্র থ্রেট কালচারেরর পৃষ্ঠপোষক। রাজ্যের কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন, টাস্কফোর্স নিষ্ক্রিয়; আমরা বলছি মানুষের দাবিতে আমরা রাজপথে থাকব। দাবির অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য লড়াই করব। ভুঁইফোড় দালালরা যদি আক্রমণ নামিয়ে আনার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। লুঠের সম্পদ তৈরির দালালদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। আবাস যোজনার দাবি নিয়ে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। অতীতের মতোই আগামীদিনেও মানুষের স্বার্থবাহী যে কোনো দাবি নিয়ে সংগঠনের লড়াই আন্দোলন চলবে তাকে যতই রাজনীতি করা হচ্ছে বলা হোক না কেন। থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই আমাদের লড়াই চলছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে আমরা ছিলাম। ১৪ আগস্টের রাতজাগা, জনজাগরণ ও গণচেতনা মঞ্চের ডাকে পরবর্তীতে জনচেতনা মঞ্চ গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও জনগণের আন্দোলন একই সাথে চলবে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংগ্রামী জারি থাকবে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে দেশের সংবিধান সুরক্ষিত থাকবে। সভাপতি মানস দাসের আহ্বানে কেন্দ্রীয় সমাবেশে উপস্থিত সকলে ১৩ দফা দাবিকে সমর্থন জানানোর পরবর্তীতে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের শপথ নিয়ে এদিনের অবস্থান ও কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। □

দেবাশীষ রায়

Editor : MANAS KUMAR BARUA | State Co-ordination Committee | Regd. No. : 18484/71
SANGRAMI HATIAR | 52nd Year, 5th & 6th Edition, September-October, 2024

বিচারের বাণী...

সুমিত ভট্টাচার্য

আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যা করার পরে, চার মাস কেটে গেছে। অথচ ন্যায় বিচার এখনও অধরা। শুধু অধরাই নয়, ন্যায় বিচার আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, সে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন ওঠাটা খুব অস্বাভাবিকও নয়। কারণ যাঁদের ওপর নিহত তরুণীর (অভয়া) বাবা, মা, পরিবার ও নাগরিকরা ভরসা করেছিলেন, সেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিবিআই) তাদের তথাকথিত তদন্ত এখনও শেষ করে উঠতে পারেনি। এমনকি প্রাথমিক ভাবে একজন অভিযুক্ত সম্পর্কে চার্জশিট পেশ করা ছাড়া, ঘটনার চার মাস পরেও আর কোনো অভিযুক্ত সম্পর্কে কোনো সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করতে পারেনি।

একজন চুনোপুঁটি (সিভিক ভলান্টিয়ার)-র বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার পরে, বাকি অভিযুক্তরা, যারা চুনোপুঁটি নয়, বড় বড় কাতলা মাছ (প্রভাবশালী), আর জি করের ঘটনায় তাদের বিভিন্নভাবে যুক্ত থাকার বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হলেও, সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে গিয়ে হোঁচট খেতে শুরু করেছে। ফলত, আর জি কর হাসপাতালের পূর্বতন প্রিন্সিপাল, এবং হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত থানার শীর্ষ আধিকারিক জামিন পেয়ে গেছেন। ঘটনার দিনই তথ্য প্রমাণ লোপাট করার জন্য উক্ত দুই ব্যক্তি ও তাদের পারিষদবর্গ সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি ঘটনাস্থলের আশেপাশে মেরামতি করার জন্য রাতারাতি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভাঙার কাজও শুরু হয়ে গেছিল। রাতের অন্ধকারেই নিহত তরুণীর বাবা, মা ও আত্মীয়-পরিজনকে কিছু না জানিয়েই দেহ দাহ করার জন্য পাচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছে বাধা না দিলে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার কাজ সেরে ফেলা হত। অপরাধী চক্র সেটাই চেয়েছিল। বামপন্থী ছাত্র-যুবরা বাধা দেওয়ার ফলেই এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা সফল হয়নি, তবে নিজেদের গা বাঁচানোর কৌশল জারি ছিল। যে হাসপাতালে ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই তড়িঘড়ি লোক দেখানো পোস্ট-মর্টেম করে, হঠাৎই উদিত হওয়া এক কাকুর তত্ত্বাবধানে, এমনকি মৃতার বাবার-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্রুত দেহ দাহ করে ফেলা হয়েছে। যাতে পুনরায় অন্য কোনো হাসপাতালে সঠিক পদ্ধতিতে পোস্ট মর্টেম করার কোনো সুযোগ না থাকে।

এই নৃশংস ঘটনার খবর জানাজানি হতেই নাগরিক সমাজের মধ্যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। ধর্ষণ ও হত্যার মতো নারকীয় ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে, তা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তো ছিলই। তাছাড়া বিভিন্নভাবে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ। সব মিলিয়ে ক্ষোভের বারুদ জমেই ছিল। নিজেরই কর্মস্থলে, যা নিজের বাড়ির পরেই সব থেকে নিরাপদ জায়গা বলে সকলে মনে করে, ডিউটিরত একজন চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যা, সেই ক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে। ফলে ১৪ আগস্ট রাত থেকেই প্রতিবাদী মানুষের ঢল নেমেছে রাস্তায়। নাগরিক সমাজের এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ-আন্দোলন স্বাধীনতাউত্তর পশ্চিমবাংলা কখনও দ্যাখেনি। আন্দোলনে নেমেছেন সর্বস্তরের চিকিৎসকরাও। শুধুমাত্র ন্যায় বিচার চেয়ে গড়ে উঠেছে একাধিক প্রতিবাদী মঞ্চ। যারা কখনো এককভাবে কখনও সম্মিলিতভাবে নতুন নতুন গান, কবিতা, নাটক, শ্লোগান তৈরি করে বিভিন্ন ফর্মে প্রতিবাদ করছেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমলক শাস্তির দাবি করছেন। পিছিয়ে থাকেনি আমাদের রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলিও। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ প্রতিটি সংগঠন নিজস্ব কর্মসূচীর পাশাপাশি ১২ই জুলাই কমিটি ও যৌথ মঞ্চের ব্যানারে একাধিক কর্মসূচী করেছে। এমনকি সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ কর্মসূচীর জন্য গড়ে তোলা হয়েছে 'জনচেতনা মঞ্চ'। নার্সিং কর্মচারীদের সংগঠন, অবসরপ্রাপ্তদের সংগঠনও পথে নেমে প্রতিবাদ করছে। এক কথায়, গত তেরো বছর ধরে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ও বাইরে যে 'থ্রেট কালচারে'র আবহ গড়ে তুলেছে শাসকদল, তার পাল্টা জবাব দিতে মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এখানেই ভয় রাজ্যের শাসকদলের। শুধুমাত্র ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ড তো নয়। গা ঘিন ঘিন করা যে দুর্নীতির তথ্য জনসমক্ষে আসতে শুরু করেছে, তাতে সাধারণ মানুষের হতবাক অবস্থা। এর আগেই জানা ছিল, দুর্নীতি এই রাজ্যের শাসকদলের অঙ্গের ভূষণ। সারদা, নারদা, টেট, এসএসসি, সোনা, কয়লা, গরু, বালি, আবাস যোজনা, রেশন---তালিকা ক্রমেই লম্বা হচ্ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—যার ওপর নির্ভর করে মানুষের বাঁচা-মরা, সেখানেই একের পর এক দুর্নীতির যে তথ্য সামনে এসেছে, তাতে নাগরিক সমাজ হতবাক। টাকা-পয়সার বিনিময়ে পাশ করানো, ডিগ্রী দেওয়া, জাল-ওষুধের কারবার, মর্গে পড়ে থাকা মৃতদেহ নিয়ে ব্যবসা কী নেই সেখানে! সাধারণ মানুষ একথাও বুঝতে শুরু করেছেন, রাশি রাশি স্তূপাকৃতি দুর্নীতির নল দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়, তার আলটিমেট ডেস্টিনেশন কোথায়। কোন্ ভাণ্ডারে জমা পড়ে সব দুর্নীতির মোটা অংশ। পরিস্থিতিই সাধারণ মানুষের যে বোধোদয় ঘটাচ্ছে, তাকে রুখতে মরিয়া শাসকদল শুরু থেকেই বিভিন্ন নাটক করছে। বিচার চাই বলে পথে নেমে লোকদেখানো মিছিল করা, হঠাৎ করেই বিধানসভার অধিবেশন ডেকে ফাঁসির আইন তৈরি করা, ন্যায় বিচারের সোচ্চারিত আওয়াজকে চাপা দেওয়ার জন্য পুজো কার্নিভালের ধামাকা—মরিয়া প্রচেষ্টা চলেছে নাগরিক আন্দোলনকে দমন অথবা বিপথে চালিত করার। তাতেও যখন কাজ হয়নি, তখন দিল্লির মসনদের সাহায্য নিয়ে সিবিআই-এর পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে। যাতে সিবিআই শামুকের গতিতে তদন্ত চালায় আর মুল প্রভাবশালী অভিযুক্তরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পুনরায় বহাল তবিয়তে দুর্নীতির সমুদ্রে ডুব মেরে, শাসকদলের দু-নম্বরী তহবিল পুষ্ট করতে পারে। এতে দিল্লীশ্বরের লাভ কী? তাদের লাভ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত। প্রতিবাদী নাগরিক আন্দোলনের স্বাভাবিক অভিমুখ বামমুখী। যে বাম আবহাওয়াকে বহু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দুর্বল করা গেছে, তা যদি পুনরায় গড়ে ওঠে, তাহলে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় শাসকেরই রাজনৈতিক লোকসান অনিবার্য। পর্দার সামনে কুস্তি আর পর্দার পিছনে সেটিং---এই দ্বি-মুখী পরিকল্পনা রচনাই তো করা হয়েছে বাম, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে রোখার জন্য। তাই আপাতত 'সেটিং'-এর খাঁচায় বন্দী সিবিআই চিড়িয়াখানার খাঁচাবন্দী বাঘের মতো মাঝে মাঝে ডাকছে আর আড়মোড়া ভাঙছে।

এত কিছুর পরেও শেষ ভরসা যাঁরা হতে পারেন, সেই মহামান্য..... কী করছেন বা করবেন তাঁরা? দেখা যাক। অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কী? কিন্তু অপেক্ষা মানে নিশ্চেষ্ট বসে থেকে অপেক্ষা নয়। রাস্তা না ছেড়ে প্রতিবাদ করে যেতেই হবে। □

এ আই এস জি ই এফ-র জাতীয় কার্যনিবাহী কমিটির সভা

গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহরে জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির দু'দিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং রাজ্যগুলির নানাবিধ পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ করা হয় এই সভাতে। মোট ৫৪ জন প্রতিনিধি ১৫টি রাজ্য থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার সভার প্রাথমিক পর্বে ১৫ দফা এ্যাজেন্ডাকে সামনে রেখে বিগত কর্মসূচীগুলির পর্যালোচনা করেই আগামী করণীয় সম্পর্কে খুবই সুচিন্তিত ও স্পষ্টভাবে জোরালো আহ্বান প্রস্তাবনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ১১ দফা জরুরি দাবি সনদ তৈরি করে দাবি আদায়ে গোটা দেশজুড়ে সমস্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচার ও সংগ্রাম-আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন।

১১ দফা দাবিগুলি হল ঃ

১। PFRADA বিল বাতিল, NPS / UPS বন্ধ করো।

২। চুক্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ চুক্তির নিয়োগ বন্ধ এবং সরকারী দপ্তরে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ।

৩। বেসরকারীকরণ বন্ধ কর। সরকারী দপ্তরে কর্মী সঙ্কোচন করা চলবে না।

৪। অষ্টম বেতন কমিশন গঠন কর।

৫। কেরালা, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যগুলির ন্যায় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও পে কমিশন চালু করতে হবে।

৬। সমস্ত বকেয়া ডি.এ. মিটিয়ে দিতে হবে।

৭। কর্মরত / পেনশনার / চুক্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য সমস্ত হাসপাতালগুলিতে Cashless চিকিৎসার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮। জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল কর।

৯। সংবিধানের ৩১০, ৩১১ (২) ক, খ, গ ধারা বাতিল কর।

১০। দেশের সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা সহ সমস্ত প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে।

১১। আয়করপ্রদানের সিলিং ১০ লক্ষ টাকা করতে হবে।

এছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকটি জরুরি বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ নেওয়া হবে এবং সেই মর্মে—

১। অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবি খুব দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পত্র দিয়ে জানানো হবে।

২। রাজ্য কর্মচারীদের জন্য বেতন সংশোধন এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেবার প্রয়োজনে দেশের ১৬তম জাতীয় অর্থ কমিশনের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হবে।

৩। সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলিকে পে কমিশন গঠন এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবি জানিয়ে পত্র দিতে হবে।

৪। সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট রাজ্যের প্রশাসনে চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ এবং সমস্ত শূন্যপদ পূরণের দাবি জানানো হবে।

৫। দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রস্তুতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজ নিজ রাজ্যের সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তুলবে। স্লোগান হবে "যৌথভাবে ধর্মঘট"।

৬। সমস্ত বকেয়া দাবিগুলি নিয়ে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে সংগ্রাম আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার গড়ে তুলতে হবে। পোস্টারিং, হোর্ডিং, ব্যানার, হ্যান্ডবিল সহ প্রচারে যেতে হবে। প্রতিটি জেলা সদরে কনভেনশন, তাকে কেন্দ্র করে ব্লক স্তরে সাধারণ সভা এবং আগামী আগস্ট '২০২৫ মাস জুড়ে ভেহিকেল জাঠা সংগঠিত করতে হবে।

৭। "জাতীয় প্রতিবাদ দিবস" আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিপালন করা হবে। ২৪ ঘণ্টার অবস্থানধর্মী এই কর্মসূচী করতে হবে। একে কেন্দ্র করে গোটা দেশ জুড়ে জেলা সদরগুলিতে ধরনার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৮। সদস্য সংগ্রহের অভিযানে নামতে হবে। সর্বভারতীয় সংগঠনের সদস্যভুক্তি হিসেবে সদস্য পিছু ২ টাকা করে রাজ্য থেকে কেন্দ্রে আগামী জানুয়ারি '২৫-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

৯। আগামী মার্চ-আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে বিভিন্ন ভাগে ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষার সভা সংগঠিত করা হবে।

১০। 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'—আগামী ৮ মার্চ প্রতিপালিত হবে। স্লোগান হবে "Occupy the Street".

১১। ওড়িশা রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত কুমার নায়েকের প্রতিহিংসামূলক বদলী এবং গত ৩ বছর ধরে বেতন বন্ধের প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১২। বিদ্যুৎ পরিষেবার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের কর্মচারীরা লড়াই করছেন। রাজ্যগুলিতে ESMA জারি করা হয়েছে। "Solidarity to struggle against Electricity Privatisation"— সংগঠনগুলিকে এই কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। □

দেবব্রত রায়

শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সফল হল সম্মেলন

গত ৪ ও ৫ জানুয়ারী ২০২৫ কলকাতার বেলগাছিয়ায় ভেটেরিনারি কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের ২১তম রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যের পালা বদলের পরে সংগঠনের সদস্যদের বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারি কলেজের ক্যাম্পাস থেকে উৎখাত করার পর প্রায় চোদ্দ বছর বাদে শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের চোখে চোখ রেখে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ৪ জানুয়ারী ২০২৪ সকালে এক দৃপ্ত মিছিলের মধ্য দিয়ে দখল হওয়া শহীদ বেদী আবার পুনর্দখল করার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিরা সম্মেলনের সুর বেঁধে দিয়েছিল। সম্মেলন মঞ্চের নাম দেওয়া হয়েছিল সলিল চৌধুরীর নামে।

মিছিলের শেষে, সংগঠনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের রক্তপতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য নেতৃত্বদের রক্তবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রকাশ্য অধিবেশন। প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এছাড়াও এই প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর নেতা ডাঃ সুকণ্যা ঘোষ, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সমিত কুমার নন্দী ও ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস। প্রকাশ্য অধিবেশনেই সমিতির মুখপত্র 'ফার্মাসিস্ট বার্তা' প্রকাশ করা হয় বিশেষ অতিথি ডাঃ সুকণ্যা ঘোষের মাধ্যমে।

রাজ্য সম্মেলনের শুরুতেই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক বিমান মাইতি, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিত এবং খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন অপর যুগ্ম সম্পাদক সিদ্ধার্থ কুমার নাথ। রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ১১০ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে ২ জন মহিলা সহ ২১ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্য দিয়ে শাসকের রক্তচক্ষুকে দূরে সরিয়ে কলকাতার প্রশাসনিক কেন্দ্রে এই সম্মেলনকে অনুষ্ঠিত করার সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের জীবন যন্ত্রণার সমস্যাগুলি যেমন তুলে ধরেছেন, একই সাথে রাজ্য ও দেশজুড়ে সরকারগুলির জনবিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ও একই সাথে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ও অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক, যথাক্রমে দেবশংকর সিংহ ও সিদ্ধার্থ কুমার নাথ। সম্মেলনে আলোচিত সমগ্র আলোচনাকে ধারণ করে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অনাথ বন্ধু মণ্ডল।

রাজ্য সম্মেলন মঞ্চ থেকে ৫ জন মহিলা সহ ৩৮ জনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। একই সাথে সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্র সিংহ রায়, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অনাথ বন্ধু মণ্ডল, যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে বিমান মাইতি ও সিদ্ধার্থ কুমার নাথ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ভাস্কর পণ্ডিত পুনর্নির্বাচিত হন। এছাড়াও সম্মেলন মঞ্চ থেকে দপ্তর সম্পাদক হিসাবে নব নির্বাচিত হন কল্যাণ মালিক এবং একই সাথে ২০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ও[illegible] ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অ[illegible] কমিটির [illegible] কর্তৃক
১০-এ শাঁখ[illegible] স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।

CS CamScanner